শব্দল্যাব

সাহিত্য সাময়িকী ২০২৫

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

CamScanner

শব্দল্যাব

সাহিত্য সাময়িকী ২০২৫

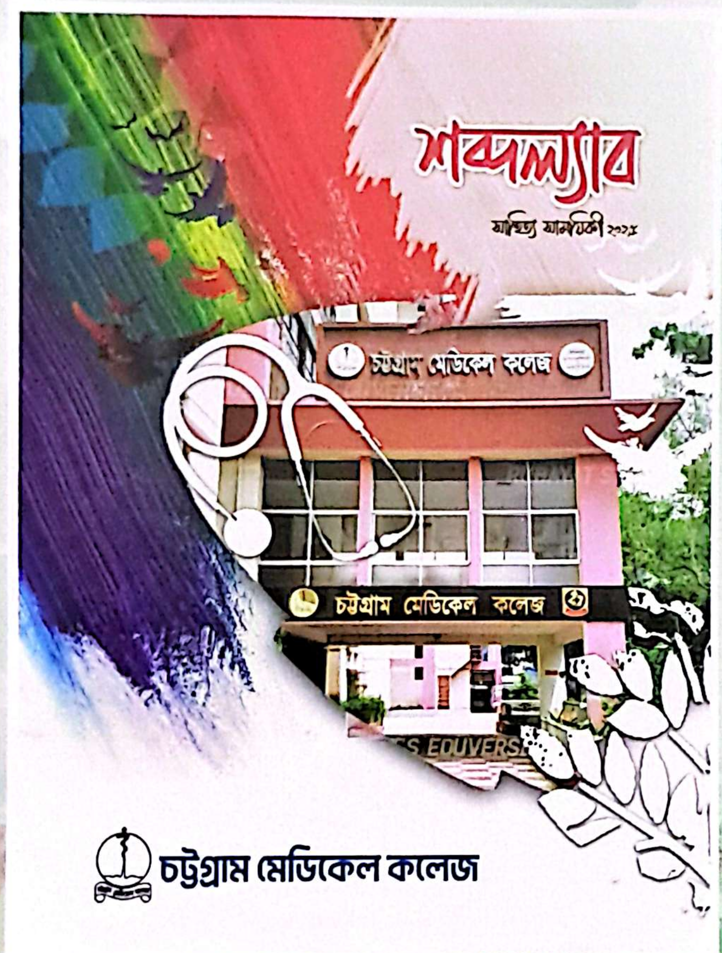

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

CamScanner

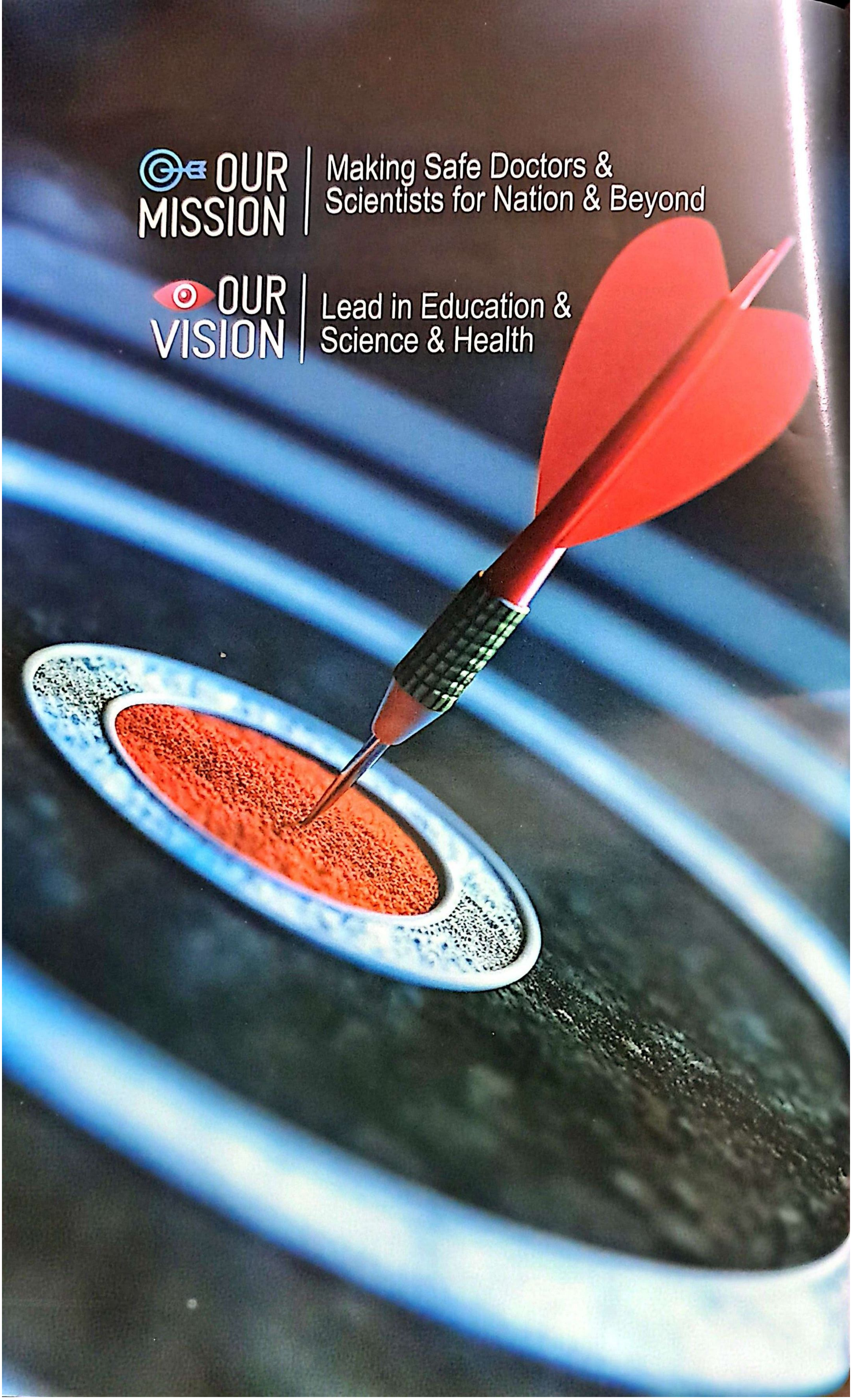
OUR MISSION
Making Safe Doctors &
Scientists for Nation & Beyond
OUR VISION
Lead in Education &
Science & Health

CamScanner

প্রকাশনা পর্ষদ

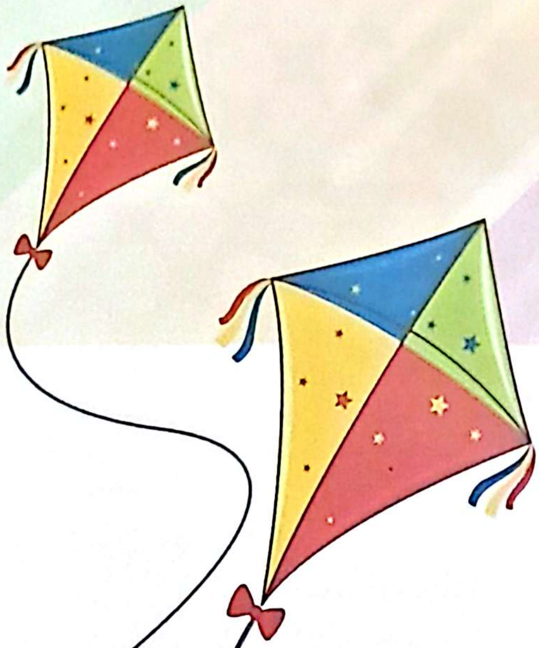

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

পৃষ্ঠপোষক
অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আব্দুর রব
উপাধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

সম্পাদক
অধ্যাপক ডা. এনশাদ একরামুল্লাহ
সহযোগী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদ

ডা. জুনায়েদ মাহমুদ খান, সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, চর্ম ও যৌনরোগ বিভাগ

ডা. উম্মে ফাতেমা খাতুন, সহযোগী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ

ডা. মুহাম্মদ আবদুর রহিম, অধ্যাপক, ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগ

ডা. মেরিনা আরজুমান্দ, জুনিয়র কনসালটেন্ট, মেডিসিন বিভাগ

ডাঃ একিউএম মহিউদ্দিন মাসুম, প্রভাষক, ওরাল মাইক্রোবায়োলজি, ডেন্টাল ইউনিট

১ম প্রকাশ: জুলাই ২০২৫

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: কে.এফ. টিটু
মুদ্রণে: সেইভ টেক্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০২ ৩৩৩৩ ৫৭২৬৬, ০১৮১৪ ৩০৪৯৫৮

সূচি

বাণী	০৫-০৬
সম্পাদকীয়	০৭
সাহিত্য কমিটি	০৮
স্মৃতিকথা, প্রবন্ধ ও কবিতা	০৯-৫৩
স্মৃতির এ্যালবাম	৫৪-৬০

বাণী

অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
অধ্যক্ষ
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের সাহিত্য সাময়িকীর নতুন সংখ্যাটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, এ আমাদের জন্য এক অনন্দময় ও গৌরবের মুহূর্ত। চিকিৎসা শিক্ষা শুধু পাঠ্যবই ও ক্লিনিক্যাল দক্ষতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; মানবিক বোধ, সৃষ্টিশীল মনন ও নান্দনিক রুচির বিকাশও একজন পরিপূর্ণ চিকিৎসকের গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়। সাহিত্য সেই পথকে আলোকিত করে।

এই সাময়িকীর পাতায় আমাদের শিক্ষার্থীদের ভাবনা, অনুভূতি, স্বপ্ন ও জীবনের বহুবর্ণ স্পর্শ ধরা থাকবে - যা কেবল লেখনীকে সমৃদ্ধ করে না, ভবিষ্যতের চিকিৎসকদের মানবিক মূল্যবোধকেও দৃঢ় করে। আমি বিশ্বাস করি, এই প্রচেষ্টা আমাদের প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরও সমুন্নত করবে।

যারা নিষ্ঠা ও শ্রম দিয়ে সাময়িকীটির সম্পাদনা, রচনা ও প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাদের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। আশা করি, এই সংখ্যাটি পাঠকদের মনে নতুন অনুপ্রেরণা জাগাবে এবং আগামী দিনের সৃষ্টিশীলতাকে আরও গতিশীল করে তুলবে।

(অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন)

বাণী

অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আব্দুর রব
উপাধ্যক্ষ
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের সাহিত্য সাময়িকীর নতুন সংখ্যা প্রকাশের গভীর আনন্দ ভাগ করে নিচ্ছি। শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যস্ততার মাঝেও সৃষ্টিশীলতার চর্চা আমাদের মননকে সমৃদ্ধ করে, মানবিকতা জাগ্রত রাখে এবং ভবিষ্যৎ চিকিৎসকদের দৃষ্টিকে আরও বিস্তৃত করে তোলে।

এই সাময়িকীর প্রতিটি লেখা আমাদের শিক্ষার্থীদের অন্তর্গত ভাবনা, স্বপ্ন ও অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ-যা শুধু সাহিত্যচর্চাকে নয়, চিকিৎসা পেশার মানবিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করে। সৃজনশীলতা, সংবেদনশীলতা ও নৈতিকতার এই মেলবন্ধন আমাদের প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

যারা আন্তরিক শ্রম, সময় ও মেধা দিয়ে সাময়িকীটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি জানাই গভীর কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। আশা করি, এই সংখ্যা পাঠকের মনে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে এবং আমাদের সংস্কৃতি চর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

(অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আব্দুর রব)

সম্পাদকের কলম থেকে...

সৃষ্টি মানুষের স্বপ্ন, ভাবনা ও অস্তিত্বের এক নীরব উচ্চারণ। একেকটি শব্দ যেন জীবনের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা, আনন্দ, বেদনা, সংগ্রাম ও আশার বহুমাত্রিক প্রতিধ্বনি। সেই প্রতিধ্বনিগুলোকে একত্রে বেঁধে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অবারিত আনন্দেই আমাদের সাহিত্য সাময়িকীর এই নতুন সংখ্যা।

চিকিৎসা জগতের ব্যস্ত ও কঠোর বাস্তবতার ভেতরেও আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়ত খুঁজে ফেরেন অনুভূতির একটি কোমল ক্ষেত্র-যেখানে তারা শুধুই ছাত্র নয়, মানুষ; যেখানে হাতে স্টেথোস্কোপ নয়, থাকে কলম-যে কলম তাদের মনের অন্দরজগতকে আলোকিত করে।

এই সংখ্যার প্রতিটি লেখা সেই অন্তর্নিহিত আলোরই প্রকাশ। কখনো কবিতার সুরে, কখনো গল্পের বিস্ময়ে, কখনো প্রবন্ধের নিরীক্ষায় আমাদের লেখকেরা ধরা দিয়েছেন তাদের নিজস্ব দৃষ্টি, স্বকীয় ভাবনা এবং অদম্য সৃজনশক্তি নিয়ে।

একজন সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে তাদের এই সৃষ্টিশীল পথচলার সাক্ষী হওয়াই আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

এই সাময়িকী প্রকাশে যারা দিন-রাত পরিশ্রম করেছেন-লেখক, উপদেষ্টা, সহ-সম্পাদক এবং পুরো প্রকাশনা টিম-সবাইকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। আপনাদের শ্রমেই নির্মিত হয়েছে এই ছোট অথচ গভীর সাহিত্যভুবন।

পাঠকদের উদ্দেশ্যে শুধু এইটুকুই বলতে চাই-শব্দের ভেতর যে আলো থাকে, তা আমাদের দেখায় আরেক ধরনের পথ; সেই পথেই চলার আমন্ত্রণ রইল।

(ডাঃ এনশাদ একরাম উল্লাহ)
সহযোগী অধ্যাপক
মেডিসিন বিভাগ

CamScanner

সাহিত্য কমিটি

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ
প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা

অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আব্দুর রব
উপাধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ
উপদেষ্টা

অধ্যাপক ডা. এনশাদ একরামুল্লাহ
সহযোগী অধ্যাপক
মেডিসিন বিভাগ

ডা. জুনায়েদ মাহমুদ খান
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
চর্ম ও যৌনরোগ বিভাগ

ডা. মুহাম্মদ আবদুর রহিম
অধ্যাপক
ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগ

ডা. উম্মে ফাতেমা খাতুন
সহযোগী অধ্যাপক
মেডিসিন বিভাগ

ডা. মেরিনা আরজুমান্দ
জুনিয়র কনসালটেন্ট
মেডিসিন বিভাগ

ডাঃ একিউএম মহিউদ্দিন মাসুম
প্রভাষক
ওরাল মাইক্রোবায়োলজি
ডেন্টাল ইউনিট

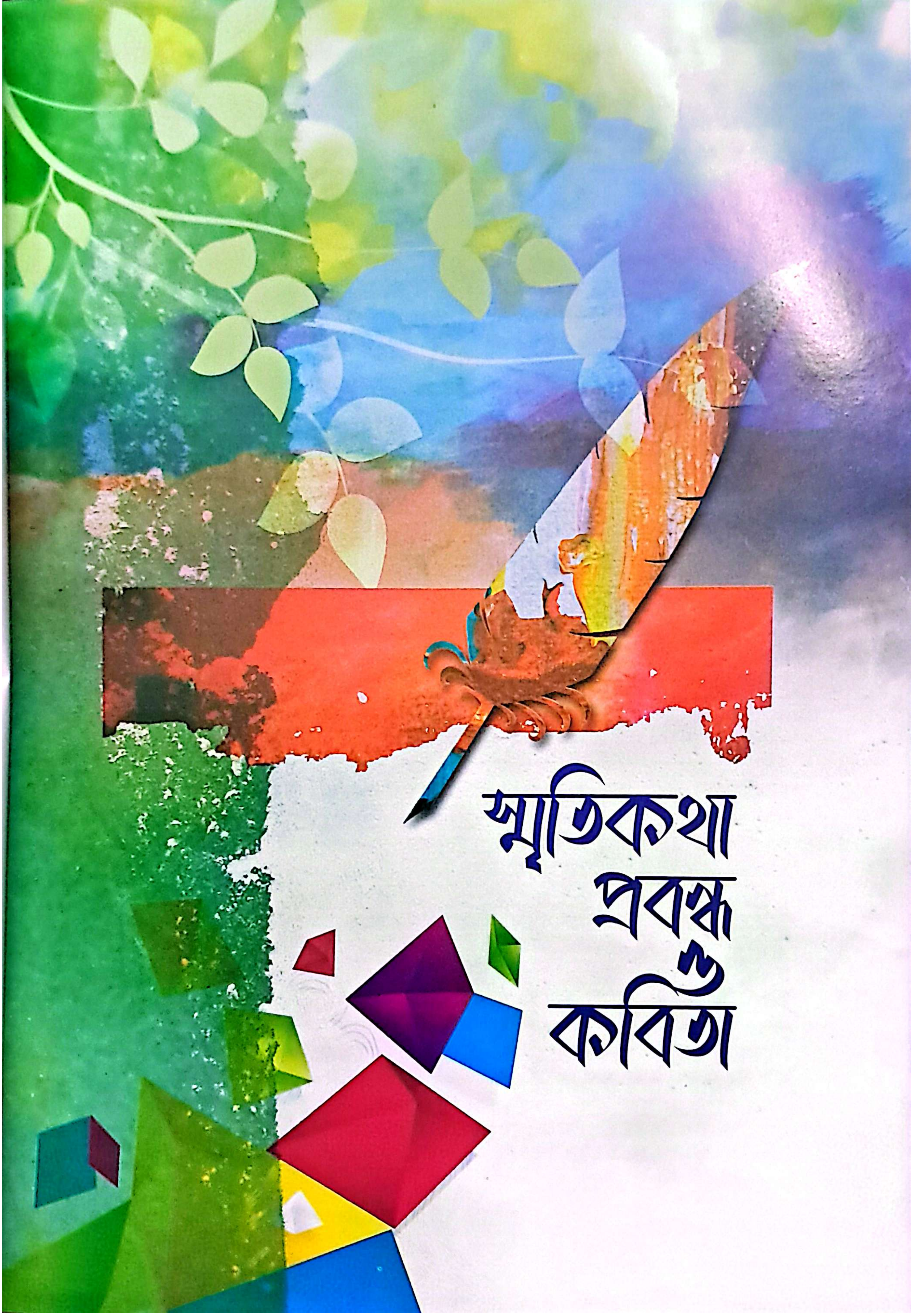

CamScanner

নিতু তোমাকে

ডা. মনোজ বড়ুয়া
সহযোগী অধ্যাপক ও প্রধান
ডেন্টাল ইউনিট, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

হিম হিম স্নিগ্ধ কোমল মৃদু বাতাস বয়ে আসছে জানালা দিয়ে। মোরগদের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমাদের ছাদ নিবাসী মোরগ মুরগী! সারারাত বিশ্রাম নেওয়া সূর্যদেবের একটু একটু গাঝারায়, আলোময় হয়ে উঠছে চারপাশ। ছাদে উঠলে হয়তো দিগন্তের সেই কমলা রেখাও দেখা যাবে। হয়তো দেখা যাবে প্রদীপদা তার নাতিকে নিয়ে মন্ত্র পড়ছেন -

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতো'স্মি দিবাকরম্

এমন নিঃসঙ্গ সুন্দর একলা মূহূর্তগুলোতে নিজেকে নিয়ে অসহায় লাগে। তাই ইচ্ছে হচ্ছে না উঠতে। কিছুক্ষণ পরেই শুনতে পাবো টুনটুনির মিষ্টি ডাক। তারপরই শুরু হয়ে যাবে চরুই, শালিকের কিচিরমিচির। কবুতরের বকবকুমি। একটু বেলা হলেই শুরু হয় কাঠবিড়ালির একটানা ডাক। আর দুপুর ছাড়ার বেলায় বিপন্ন বিষন্ন ঘুঘুর কান্না। শহরে থেকেও গ্রামীণ ফ্লেভার! আমি রুমে শুয়ে বা বারান্দায় বসে সবই শুনি। ধীরে ধীরে নিজেই বিষন্ন অবশ হয়ে উঠি। একটা শান্তি শান্তি ভাব নিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। মনে কতো ভাবনার মেঘ ভেসে বেড়ায়। খপ করে একটাকে ধরলেই হলো। আমি না ধরতে চাইলেও তারাই আমাকে ধরে। যেমন আজ ধরেছে নিতু আমাকে। ধীরে ধীরে নিতু আমাকে পেয়ে বসে। ভেসে যাই সেই সুদূরে .... ।

ঝোপালো আমগাছের নীচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছি এক নিমিষে রাস্তার ওপারের বিয়ে বাড়ির দিকে। অধীর আগ্রহে নয়, একরাশ হতাশা আর বিষন্নতা নিয়ে।

টুনি লাইটের সবুজ আর সোনালী আলোয় মনে হয় ইন্দ্রপুরী।
ঝলমলে ড্রেস পরে হাসিহাসি মুখে। হাতে উপহার নিয়ে ঢুকছে লোকজন। কাঁচের ভিতরে উজ্জ্বল আলোতে দাড়ানো মানুষগুলো যেনোসুখ ও আনন্দের উপমা। নারীদের রিনরিনে কাঁচ ভাঙা সুখেরহাসি শুনতে পাচ্ছি এখান থেকেই। বসন্ত বাতাসে ভেসে আসছে সুখাদ্যের ঘ্রাণ। সাথে মাঝে মাঝে শ্যানেল ফাইভ বা ইভিনিং প্যারিস।

আজ নিতুর বিয়ে। আমার নিতু। আজ থেকে সে আর আমার থাকবে না। সব ঘটনার আজ অবসান! সব মুছে ফেলতে হবে জীবনের সিলেট থেকে, সব সব। সমস্ত শ্বাস প্রশ্বাস, কস্তুরীঘ্রাণ, অমৃতস্বাদ, স্বর্গীয় স্পর্শ! এতো এতো স্মৃতি এখন আমি কিভাবে ভুলি!

CamScanner

তুমি ছিলে আমার চির বসন্ত কাল।
তোমার কাজল টানা গভীর কালো চোখ আমার কাছে কুহু কুহু কোকিল। আর রাঙা ঠোঁট আমার পলাশ শিমুল। যখন খুশি যত খুশি কুড়িয়ে নাও শুষে নাও।

কোন এক বসন্তে বইমেলার মাঠে গোল হয়ে বসে শুনছি কামরুল হাসান মঞ্জুর আবৃত্তি, কথোপকথন কবিতা। ফুরফুরে ফাল্গুনী বাতাস। নিতু হালকা শিশির ভেজা ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে কুটকুট করে দাঁতে কাটছে। মাথার ডানদিকে হালকা কাত। শখ করে পড়া নথ ঝিকমিক। খোপায় গোলাপ। কপালেতে লাল টিপ আর তসরের শাড়ি। হাত সাজিয়েছে শিশু একাডেমির বৈশাখী মেলার বেদেনী থেকে কেনা বেলোয়ারি চুড়িতে! যাকে বলে কাব্যিক সাজ।
এমন ভাবভঙ্গি দেখেই হয়তো শচীন কর্তা গেয়েছিলেন -

বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে
হৃদয়ে দিয়েছো দোলা
রঙেতে রাঙিয়া রাঙাইলে মোরে
একি তবে হোরি খেলা
তুমি যে ফাগুন
রঙের আগুন
তুমি যে রসের ধারা
তোমার মাধুরী তোমার মদিরা
করে মোরে দিশাহারা

নিতুর হাতে ধরে আছে গান কবিতার খাতা। খাতা সম্পূর্ণই চাঁদ তারা রাত পাখি নদী বাঁশি ফুল ভ্রমর প্রেম আমি আর তুমিতে ভরা। ভালোবাসার বানভাসি অবস্থা!
আমার দিকে চেয়ে দুষ্ট দুষ্ট হাসি। চোখ ফেরানো যায়না। চোখ গেলেও মন ফেরানো যায়না! আর ফেরানো গেলেও সামনের বর্তমান ঝাপসা হয়ে সদ্য অতীত আর সুদূর ভবিষ্যৎ খেলা করছে! আমি একদৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিলাম তাকে।
হঠাৎ তার চিমটিতে সজাগ!
- কি হলো আবীর?
নজর পড়ে যাবেতো!
আমি বললাম কাছের মানুষের নজর পড়ে না।

আহারে কাছের মানুষ!

নিতুর সাথে প্রথম দেখা চট্টগ্রাম বেড়াতে এসে এক বিয়েতে। মোম পালিশ। একেই বলে বোধহয় মোম পালিশ। আমি চেয়ে দেখছিলাম তার অঙ্গ সৌষ্ঠব ফর্সা ফ্লোরসেন্ট সদৃশ্য গাত্রবর্ণ। কোথাও কোন খুঁত নাই। মডার্ন স্বর্ণালি ঝলমল উর্মিমালা চুল, দেখাতেই ক্রাশ্ড।

দেখাদেখি শেষে বলাবলি হলো যখন আমি ইউনিভার্সিটি পড়ছি, এমনই আর এক বিয়ে বাড়ির হট্টোমেলার মাঝে। সেকি তুমুল আকর্ষণ! চারিদিকে প্রচন্ড হৈচৈ, কারো কথা কেউ শুনে না এমন! তার মাঝে আমি কারো কথা শুনছি না, শুনি শুধু নিতুর গলা!! আহা প্রেম। ক্লাবের মাঝের গোলচত্বরে বসে শুনি বাক-বাকুম পায়রার কণ্ঠ। সে আনাড়ি হাতে পড়েছে কঁচি কলাপাতা রঙ শাড়ি, কোমড়ে কাঁচা হাতের কুঁচি।
অনাভ্যস্ততা ও অস্বস্তির কারণে মোচড়ামুচড়ি!
- চুলকে দিবো?
- যাহ্ অসভ্য!!

এরপরে কত বেলা কেটে গেছে শুধুই অপলক চোখাচোখি আর হাত ধরাধরিতে! আর একটু আধটু আ[illegible]ীতে! কত যে ছেলেমানুষি! যে আগে পলক ফেলবে সেই ফেল। ভালোবাসার দৌড়ে ফেল করার ভয়ে, পলকহীন তাকিয়ে থাকতে থাকতে দু'জনের চোখই টনটন, পানি পড়া শুরু হতো এমন অবস্থা! আঙ্গুল নিয়ে মৃদু খেলা। কি খুঁজ পেতাম দু'জনে দুজনের আঙুলে? সেকি দেবরাজ ইন্দ্রের অমৃত ধারা? কি নিয়ে ছিলো সে খেলা?

মনে পড়ে হালকা টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে হোস্টেলের সামনে অধীর আগ্রহে দাড়িয়ে আছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডিস হোস্টেল। গেটের কাছের শিউলি গাছটায় আগাম ফুল ফুটেছে। ঝরে পড়ছে টুপটাপ করে। সন্ধ্যাবাতীর মতো জ্বলজ্বল করছে গাছতলা।

আয়া ঘুরে এসে বল্লো -
- আফায় রুমে নাই।
- কমনরুমে দেখেন।
- হেই হানেও নাই।

মনটা নিরাশ হয়ে গেলো। দুপুরে কতক্ষন ধরে প্লান হলো বিকালে বের হবো। একসাথে টিএসসি যাবো। ডাস এ নাস্তা করে আর্ট কলেজের অনুষ্ঠান দেখে শাহাবাগের দোতলায় সিলভানিয়ায় ছায়া ছায়া নিরিবিলিতে খেয়ে রাতে ড্রপ করে যাবো। আগস্টের বিকালের হঠাৎ বৃষ্টির কারণে নাহয় একটু দেরিই হলো! তাই বলে একাই চলে যাবে! কেমন মেয়েরে বাবা?
ফিরে আসতে যাবো তখনই চোখের কোণায় পরিচিত অবয়বের নাড়াচাড়া দেখে ফিরে দেখি সে!
অস্থির হয়ে করিডোরে হাঁটছে আর বারবার গেইটের দিকে দেখছে। আহারে বিরহিনী বিনোদিনী আমার!
আমাকে দেখতে পেয়ে মূহুর্তে সমস্ত দুশ্চিন্তা উধাও, হাসি ঝলমল মুখ। ও বের হয়ে আসতেই আবার টিপটিপ ইলশে গুড়ি শুরু। দু'জনে দৌড়ে একটা রিক্সায় পর্দার ভিতরে। বিশ্ব ভুবনে যেন শুধুই আমরা দুজন।
বসে আছি, চেয়ে আছি হাত ধরাধরি করে। গুনগুন করে একজন আরেকজনকে কি যে বুঝিয়েছিলাম আজ সবই ভুলে গেছি। শুধু মনে আছে ওই মুহূর্তে আমিই ছিলাম জগৎএর সবচেয়ে সুখি জন।

আর্টকলেজের বকুল তলার খোলা মঞ্চে উপরে তেরপাল দিয়ে গান করছেন মিতা হক, আর আমরা বিভিন্ন গ্রুপ গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে বসে আছি টানা গোল বারান্দায়। পরিচিত গানে কণ্ঠ মিলাই সবাই -

শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথযামিনী রে।
কুঞ্জপথে, সখি, কৈসে যাওব,
অবলা কামিনী রে।........ .

গানের ছন্দে মৃদু দুলনি।
ভুজ কাঁক জাং।
পাশাপাশি বসে আছি দুজন।

বৃষ্টির হালকা শীতে নিতুর হাতের উষ্ণতায় মন উষ্ণ তরল। দেখছিলাম তার পাতলা, হালকা, নরম, উজ্জ্বল, গোলাপি, কুসুমকুসুম হাতের তালুর পরিচ্ছন রেখা, লম্বা পুষ্ট চম্পা কলি অঙ্গুলি, ম্যাগনোলিয়া গ্লান্ডিফ্লোরার মাখন সদৃশ্য পাপড়ির ন্যায় স্নিগ্ধ নখ, তার দুধে আলতা সুডৌল বাহুর কোমল মৃদু মিহি পিঙ্গল কচ, আর কল্পনায় ভবিষ্যতের ফানুস!

হঠাৎ লোডশেডিংয়ে চারপাশ অন্ধকার। তখনই বুঝলাম আজ শ্রাবণী পূর্ণিমা! বৃষ্টি ভেজা বকুল-লিচু গাছের চকচকে পাতা বেয়ে পিছলে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা জোৎসনা! মেঘের আনাগোনায় ক্ষনিক ক্ষনিক চাঁদের হাসি ঝরে ঝরে পড়ছে। মৃদু বাতাসে কোমল ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির ছাঁট।
আর কি আশ্চর্য, মিতা হক তখনই ভানুসিংহ থামিয়ে ধরলেন -

আজ জোৎসনা রাতে সবাই গেছে বনে ......
কি এক হৃদয় গলে গলে পড়া গান !!

গান সাঙ্গ মেলা ভঙ্গ
উঠতে ইচ্ছা করছে না। কে চায় দেবালয় ছেড়ে যেতে!
নিতুর ডাক - আবীর অনেক হয়েছে এবার ওঠো।
টিপটিপ বৃষ্টিতে জোড়ায় জোড়ায় দৌড়ে বের হচ্ছে সবাই। নিতু আমার মাথায় ওর ওড়না পেতে হাতটা টেনে দিলো দৌড়! তারপর দিন ক্লাসে ফুঁচুত ফুঁচুত হাঁচি!!
মধু সময়! নিমিষেই উধাও।

চঞ্চলা চপলা পাহাড়ি ঝর্ণা নিতু আজ ছাঁদনাতলায় নিশ্চয়ই শান্ত। দুজনে একসাথে "কাভি কাভি" সিনেমা দেখে আজ সেটাই সত্যি।

কোন এক ভেলেন্টাইন দিবসে (অবশ্য আমার তখন প্রতিটি মূহুর্তই ভেলেন্টাইন কোন দিবস টিবস লাগে না) নিতু আর আমি কার্জন হলের পুকুর পাড়ে কুর্চি গাছের নীচে। তখন গাছে মাত্রই কয়েকটা ফুল এসেছে। সবাই খোঁপায় দেয় লাল হলুদের গুচ্ছ ফুল আর আমি পড়িয়ে দিলাম বৈধব্যের একগুচ্ছ সাদা কুর্চি !
তারই ফল বোধহয় আজ ফলছে।

এতোদিন ছিলাম স্বপ্নীল কল্পনায়।
কল্পনা করতে করতে ফানুস উড়াতে উড়াতে ভুলে যাই বাস্তবতা। ভুলে যাই ফানুসও একসময় ধরণীতে নেমে আসে।

হয়তো কোনদিন দেখব নিতু তুমি সিনেপ্লেক্সে কারো আন্তরিক বাহুলগ্নে বা মিমি সুপারে বাচ্চার স্কুল ব্যাগ বা আফমি'তে ফুলের স্টিক পছন্দ করছো।

তখন হয়তো তুমি চিনেও চিনবেনা বা দেখেও না দেখার ভানে একই ডিজাইনের ভিন্ন রঙের ব্যাগ চাইবে।
অথবা গভীর আগ্রহ নিয়ে গভীর ব্যাথা নিয়ে চাইবে আমার পানে!
যাই করো কি বা আসে যায়। তুমি বা তোমরা যুগে যুগে এভাবেই হারিয়ে গেছো।

তোমার আমার এই এক সাথে হওয়া থাকা এটাই একটা ইল্যুশন। কখনো কখনো এটা বুঝতে বুঝতে অনেক সময় পার হয়ে যায়। মাঝখানে সকাল দুপুর রাত কেটে যায়। যোগ হয় আরো কিছু সম্পর্ক, কাথা-বালিশ-ন্যাপি, ঘটি-বাটি, দলিল। এটা ভালোই হয়েছে ভোরেই যবনিকা!
এখন আর শেষ দুপুরের ছায়া ছায়া রৌদ্রে দূরাগত ঘুঘুর একলা ডাক শুনে বিছানায় উপুড় হয়ে গুমরাতে হবে না।

ধীরে ধীরে আমতলা ছেড়ে রাস্তার আলো ছেড়ে অন্ধকার ধরে হাটি। আলো ছাড়ি কিন্তু স্মৃতি ছাড়ে না। সময়ে সবই স্মৃতি! কিছু স্মৃতি মূহুর্তে অতল হয়ে যায়। আর কিছু হয় ফল্গুধারা, বহমান অন্তঃসলিলা চিরটাকাল।
এতোদিন পরে তুমি এখনো বহমান অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা !

CamScanner

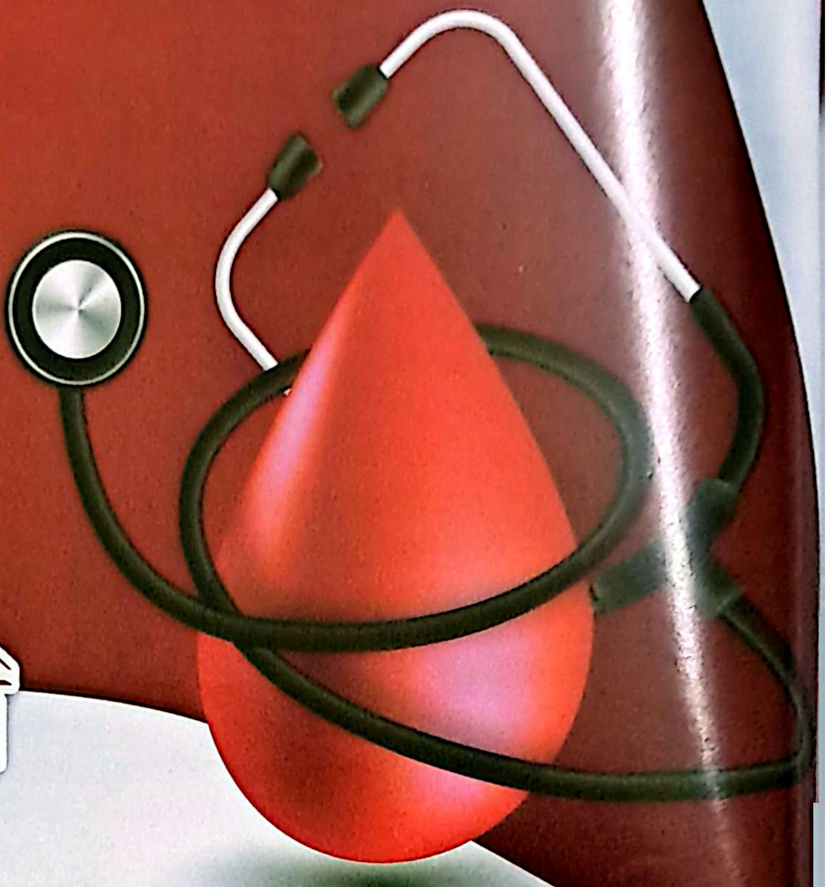

নেগিন মুরাদি

ডা. মোঃ কামরুল হাসান
সহযোগী অধ্যাপক, হেমাটোলজি বিভাগ

অগণিত ইরানী সুন্দরীর চেহারা দেখতে দেখতে যখন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি তখনই পরিচয় হয় নেগিন মুরাদির সাথে। যেমনি গায়ের রঙ, তেমনি তার মুখাবয়ব, সোনালী চোখ। ইরানীদের নাক আক্ষরিক অর্থেই উঁচু বা লম্বা হয়। গর্বিত বা অহংকারী জাতি বলেই হয়ত এদের বা এদের জাতভাই আর্যদের নাকের গঠনের কারণে বাংলা ভাষায় অহংকারী ব্যক্তির আরেক নাম 'নাক উঁচু'। কিন্তু নেগিনের নাক যথার্থই সুন্দর। শীতের পরিপাটি পোশাকের সাথে ইরানী স্কার্ফ। অপূর্ব লাগছিল তাকে। বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট ক্লিনিকে সে বসে আছে। আমরা একজন করে রোগী দেখে দেখে বিদায় দিচ্ছি আর সে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসছে রোগীর কিউ ধরে। প্রথমে বুঝতে পারিনি সে রোগী না রোগীর এটেন্ডেন্ট। বয়স মাত্র ১১।

আমার কলিগ ডা. মরিয়ম বেহফারকে বললাম, মেয়েটা কিন্তু আসলেই সুন্দরী।

বেহফার নিজেও সুন্দরী। সদা হাস্যময়ী। আমাকে অনেক হেল্প করেছে। হাসলে আরও সুন্দর লাগে। হাসি দিয়েই বলল, হ্যাঁ, মেয়েটা সুন্দরী। ইরানী মেয়েদের মধ্যে গড়পড়তার চেয়ে সুন্দরী।

মেয়েটিকে বললাম, তুমি তো ভারী সুন্দর!

আমার কথাটি ফার্সিতে ট্রান্সলেট করে দিল বেহফার। শুনে সে হাসতে থাকল। তার হাসিতে তাকে আরও সুন্দর ও মায়াময় লাগছিল।

তার কাগজ পত্র দেখলাম। হ্যাঁ। সে নিজেই রোগী। শুরুতে থ্যালাসেমিয়া ইন্টারমিডিয়া ছিল, অর্থাৎ মাঝে মাঝে রক্ত নিতে হত। কিন্তু বিগত বছর চারেক থেকে নিয়মিত রক্ত নিতে হয়। ট্রান্সপ্লান্টের জন্য এসেছে। খুব আশ্চর্য হলাম। এত জটিল একটি রোগ, বেঁচে থাকার জন্য অন্যের রক্ত নেয়াটা তার নিয়মিত কাজের একটি, দৈনন্দিন কাজ যার বিঘ্নিত হওয়ার কথা, সে এত সুন্দর থাকে কি করে! হ্যাঁ। থ্যালাসেমিয়া রোগীর চিকিৎসা এমনই মেটিকুলাস হওয়া উচিৎ। তাছাড়া ট্রান্সপ্লান্টের জন্য শারীরিক ফিটনেস প্রয়োজন। যে সব থ্যালাসেমিয়া রোগীকে নিয়মিত রক্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয় তাদেরকেই ট্রান্সপ্লান্টের জন্য বাছাই করা হয়। নিয়মিত রক্ত গ্রহণের কারণে শরীরে আয়রনের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং তা বিভিন্ন অঙ্গে জমা হতে থাকে যা ক্ষতিকর। এই আয়রন শরীর থেকে বের করে দেয়ার জন্য কোন অঙ্গ নাই। ফলে ওষুধের মাধ্যমে চিলেশনই (Chelation) একমাত্র উপায়।

CamScanner

রক্ত গ্রহণ জনিত অতিরিক্ত আয়রন জমা হওয়া বা রক্তবাহিত ইনফেকশনের কারণে লিভারে সিরোসিস হতে পারে। নিয়মিত রক্ত গ্রহণ না করলে তীব্র রক্তশূন্যতার কারণে শরীরের স্বাভাবিক নিয়মে লিভারে রক্ত তৈরি হতে থাকে এবং সে ক্ষেত্রে লিভারের সাইজ বড় হয়ে যায়। ট্রান্সপ্লান্টের জন্য নির্বাচিত থ্যালাসেমিয়া রোগীদেরকে আয়রন চিলেশনের জন্য নিয়মিত চিকিৎসা ও আয়রনের অবস্থা, লিভারের সাইজ এবং লিভারের কার্যকর অবস্থার উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যাদের নিয়মিত আয়রন চিলেশন করা হয়, লিভারের সাইজ ঠিক থাকে ও লিভারে কোনরূপ সিরোসিস বা ফাইব্রোসিস থাকেনা তাদের ট্রান্সপ্লান্ট রেজাল্ট খুব ভাল।

নেগিনকে এসব চিকিৎসা সঠিকভাবে দেয়া হয়েছে বলেই আপাত দৃষ্টিতে রোগের কোন লক্ষণ চোখে পড়েনা। ক্লাস ওয়ান অর্থাৎ সর্বোত্তম শ্রেণীতে ছিল সে। ট্রান্সপ্লান্টের জন্য সে প্রস্তুত। কিন্তু সিট খালি নেই। ৫০ বেডের বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টারটিতে শিশুদের জন্য ১০টি বেড নির্ধারিত। সরকারী খরচে চিকিৎসা হয়। ফলে সারাদেশ থেকে রোগী আসে এবং রোগীর প্রচণ্ড চাপ। ডা. বেহফারের সাথে নেগিনের মা কথা বলছে। অনেক কাকুতি মিনতি করছে। নেগিন যতটা সুন্দর, তার মা যেন ঠিক ততটাই অসুন্দর। মেয়ে আর মা একেবারে উলটো। বিদঘুটে চেহারা। ময়লা রং। যেভাবে কাকুতি মিনতি করছে তাতে তাকে আরও বিদঘুটে লাগছে। পরবর্তী তারিখ দেয়া হল আসার জন্য।

আবার এসেছে মেয়েটি। আমি তাকিয়ে আছি তার দিকে। বললাম, আমার একটা ছেলে আছে। ঠিক তোমার মত বয়স। আমার ছেলেকে বিয়ে করবে? প্রথমে সে বুঝতে পারেনি। ট্রান্সলেট করে দেয়া হলে সে আচমকা হাসতে শুরু করে দিল শব্দ করে। সে হাসি আর থামেনা। আমার ছেলেটাও কিন্তু সুন্দর। তোমার পছন্দ হবে। আবারও হাসি। ইরানে সমবয়সী বা বেশী বয়সী মেয়েদের বিয়ে করার নজির অনেক বেশী। মেয়েটির মা এবার কথা বলতে শুরু করল, তাহলে তো তুমি আমার আত্মীয় হয়ে গেলে। এখন তোমার বৌমাকে বাংলাদেশে নিয়ে যাবে নাকি তোমার ছেলেই ইরানে আসবে? হাহাহাহা করে হেসে উঠে সে।

সেদিনও ফেরত গেল সে। সিট খালি নাই। যে তারিখে আসতে বলা হয়েছিল, সে তারিখ তারা মিস করেছে। মাস খানেক পর আবার এসে হাজির। গত দিনে ডা. বেহফার ছিল না। আজ সে ক্লিনিকে উপস্থিত। বলল, ডা. হাসান, তোমার সুন্দরী এসেছে। রহস্য করে বললাম, আমি তো তাকে প্রপোজ করেছি। মানে!!

ডা. বেহফার আকাশ থেকে পড়ল। মুখ কালো করে কি বলতে যাচ্ছিল যেন। অবস্থা বেগতিক দেখে সাথে সাথেই বললাম, আমার ছেলের জন্য প্রপোজ করেছি। বৌমা বানাতে চাই।

ও।

তাই বল। আমি কি সব তোমার সম্পর্কে ভাবছিলাম। ভাবছিলাম চাইল্ড ম্যারেজের আরবীয় কালচার তোমাদের দেশেও আছে নাকি। ইরানীরা আবার আরবদের খুব ঘৃণার চোখে দেখে। সবসময় খেয়াল করেছি তারা আরবদের থেকে নিজেদেরকে আলাদা প্রমাণ করার চেষ্টা করে।

-তা, সে কি এক্সেপ্ট করেছে?

-এক্সেপ্ট করেছে বলেই তো মনে হয়। মৌনতা সম্মতির লক্ষণ। নারাজি তো হয় নাই।

বেহফার এবার নেগিনকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি তার ছেলেকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছ? আবারও হাসি।

এদিনও সে ভর্তি হতে পারলনা। রমজান মাসে আবার এল। ডা. বেহফার আগেই তাকে দেখে ফেলেছে। তোমার বৌমা এসেছে। সেও হাসতে হাসতে সরাসরি আমার সামনে এসে বসে পড়ল। আজ তো তাকে ভর্তি করতেই হবে। ভর্তি হল। ডা. বেহফার তার ফলো আপের দায়িত্ব আমাকেই দিল। বলল, তোমার বৌমাকে তুমিই দেখ। আমিও খুশি। ভর্তির পর তার সাথে কথা বলছিলাম। এই প্রথম তাকে স্কার্ফ ছাড়া দেখলাম। চুলগুলোও খুব সুন্দর। বললাম, তোমার তো এই সুন্দর চুল থাকবে না।

মানে?

মানে ট্রান্সপ্লান্টে অত্যন্ত উচ্চমাত্রার
কেমোথেরাপি দেয়া হয়।
তাতে তোমার সব চুল
উঠে যাবে।

CamScanner

ও। তাই বল। আমি সেটা জানি। আমার চুল আরও সুন্দর ছিল। লম্বা ছিল। এই দেখো।

বলেই সে তার এন্ড্রয়েড মোবাইল বের করে তার চুলের ছবি দেখাতে লাগল। অনেক লম্বা। একদম পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা। পারিবারিক অনুষ্ঠানে সে চুল সাজিয়ে নাচ গান করত। ট্রান্সপ্লান্টে কেমোথেরাপির কারণে যে চুল পড়ে যায় তা তাকে জানানো হয়েছিল। একারণেই সে ভর্তি হওয়ার আগে চুল কেটে সংরক্ষণ করে রেখেছে। আসলে এটাই নিয়ম যে এধরণের একটা বড় চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়ই চিকিৎসার প্রজ এন্ড কন্স, সাইড এফেক্ট, সাফল্য ব্যর্থতা বিস্তারিত বলা হয়।

কিছুক্ষণ পরই হেড নার্স তাকে ওটিতে পাঠিয়ে দিল। সিভি লাইন বা সেন্ট্রাল ভেনাস লাইন লাগানো হবে। বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করতে এতো এতো কেমোথেরাপি, ইম্যুনোসাপ্রেসিভ, এন্টিবায়োটিক, ব্লাড, আরো কত রকম ওষুধ শরীরে প্রয়োগ করা হয়। প্রতিদিন রক্ত পরীক্ষার জন্য ব্লাড টানতে হয়। ফলে সিভি লাইন প্রতিটা রোগীকেই লাগানো হয়। ওটি থেকে ফেরার পর নিয়মিত চেকআপের সময় দেখলাম সে ভয়ানক অসুস্থ। শ্বাস কষ্ট হচ্ছে। অক্সিজেন লাগানো হল। নিয়ম মাফিক সিভি লাইন লাগানোর পরই একটা এক্সরে চেক করা হয়। তখনও এক্সরে আসেনি। অপেক্ষায় আছি। হাসপাতালের ডেস্কটপ চেক করছি বারবার। প্রতিটা রোগীর রিপোর্ট ও অন্যান্য তথ্য হাসপাতালের নিজস্ব সার্ভারে দেয়া হয়। যে যার মত যেকোন ওয়ার্ডে থেকে অনলাইনে সেখানকার ডেস্কটপ থেকে দেখে নিতে পারে। কিছুক্ষণ পরই তার এক্সরে পেলাম। সিভি লাইন লাগাতে গিয়ে ফুসফুসের থলেতে বাতাস ঢুকে গেছে। ডাক্তারি ভাষায় যাকে নিউমোথোরাক্স বলা হয়। অনেক সময় মারাত্মক হলে জীবনহানি পর্যন্ত হতে পারে। এদেরও ভুল হয়, ফেল হয়। এতো এতো টেকনোলজি ব্যবহার করার পরও। মনে পড়ল আমার বন্ধু ডাঃ মোস্তাফিজের কথা। সিভি লাইনের ওস্তাদ। অনেক জটিল কাজও সে অনায়াসে করে আল্ট্রাসনোগ্রাফিক সাহায্য ছাড়াই। চেক এক্সরেও কদাচিৎ করে সে। তাকে কখনও ফেল করতে দেখিনি। হ্যাঁ, একবার সে ফেল করেছিল। নিডল ভেঙ্গে ফেলেছিল। সেই রোগিটাও একটা সুন্দরী মেয়ে ছিল। রোগিণীর সৌর্ন্দযে হয়তো সে মনোযোগ বা কনফিডেন্স হারিয়ে ফেলেছিল। সাথে সাথেই সিভি লাইন খুলে দিলাম।

অবস্থা সেটেল্ড হলে দুইদিন পর তাকে ছুটি দেয়া হল।

একমাস পর আবারও তাকে ভর্তি করানো হল। এবার তার মা খুবই অনুনয় বিনয় করছে।

দেখুন, আমার এতিম মেয়েটিকে দয়া করুন। এবার যেন আর ভুল না হয়।

এতিম মানে? আমি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

মেয়েটা এতিম। বাবা মা বেঁচে থেকেও নেই। বাবা মা ভালবেসে বিয়ে করেছিল। আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে নয়, অনাত্মীয় বিয়ে। যদিও ইরানী সমাজে আত্মীয়র মধ্যে বিয়ে করার প্রবণতা অনেক বেশী এবং এই কারণে এখানে থ্যালাসেমিয়া রোগীর সংখ্যাও বেশী। বিবাহপূর্ব থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষার জন্য এদেশে আইন আছে বলে শুনেছি। ভালবাসার বিয়ের কারণেই হয়তো কেউ আর নিজেদের এই পরীক্ষা করে নাই। বিয়ের পর তাদের দুটি সন্তান হয়। বড় সন্তান ছেলে। সেই নেগিনের ডোনার। বিটা থ্যালাসেমিয়া ট্রেইট। নেগিনের জন্মের পর অনেকদিন কিছু বোঝা যায়নি। বয়স বছর দুয়েক হলে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন পরীক্ষা করে থ্যালাসেমিয়া নিশ্চিত হয়। বাবা মা দুজনই ট্রেইট। অতঃপর তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ। স্বামী ও সন্তানদেরকে ছেড়ে তাদের মা অন্য পুরুষের হাত ধরে চলে যায়। ঠিক কি কারণে তাদের বিয়ে বিচ্ছেদ হয়েছে তা নিশ্চিত ছিলাম না। তবে তার এই কথিত মা বলছে যে তারা আর অসুস্থ বাচ্চা পয়দা করতে চায়না বলেই এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মাতৃতান্ত্রিক ইরানী সমাজে বিবাহ ও সংসারে মহিলারা মাত্রাতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে থাকে। বাবাটি আর বিয়ে করেনি। এই মহিলা হচ্ছেন নেগিনের জ্যাঠাই মা। সেই থেকেই নিজের সন্তানের মত করে মানুষ করছেন। নেগিনের চিকিৎসার ব্যাপারে তার আকুতি আর তৎপরতায় কখনই মনে হয়নি যে তিনি জন্মদাত্রী নন। শুনতে শুনতে চোখ ভারী হয়ে এলো। মানুষ কত ভাল হতে পারে! মায়েরা কত মমতাময়ী হতে পারে! নেগিনের জন্মদাত্রীও মা, এই মহিলাও মা।

শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এলো।

CamScanner

অনুপ্রেরণা

ডা. মোহাম্মদ দিদারুল আলম
সহযোগী অধ্যাপক, দন্ত বিভাগ
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

এখন রাত প্রায় নয়টা বাজে। চেম্বারের রোগী দেখা শেষ। এমন সময় মোবাইল স্ক্রিনে ভেসে উঠে একটি অচেনা নম্বর। রিংটোন শুনতে পেয়ে ডাক্তার রাহাত মোবাইলের ওকে বাটন টাচ করতেই কানে বাজতে লাগল নম্র স্বরের এক নারী কণ্ঠে ঐপার থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হ্যালো, আপনি ডাক্তার রাহাত ভাই বলছেন?

হ্যা, আপনি?

আমি ফাইজা বলছি। ফৌজদারহাট হাই স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক হাশিম স্যারের মেয়ে।

ও ধরা গলায় খুবই পেরেশানির সাথে বলল, আমার বাবা ভীষন অসুস্থ। আব্বার ডায়েরি থেকেই আপনার মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করেছি। বাবা বলেছে, আপনাকে বিষয়টি জানাতে। আব্বার বুকে হঠাৎ তীব্রভাবে ব্যাথা এবং হাটতে গেলে পায়ের শিরায় টান পড়া শুরু হলে ডাক্তার মারুফের কথায় গতকাল উনাকে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে ভর্তি করা হয়েছিল। শুনে ডাক্তার রাহাত খুবই উৎকণ্ঠা ও পেরেশান হয়ে পড়ল। সাথে সাথেই বলল, দুশ্চিন্তা করোনা। আমি এক্ষুন আসছি। কল্যানপুর ইবনে সিনা হাসপাতালের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রাহাত চেম্বার থেকে বেরিয়ে রওয়ানা দিলো ঢাকা ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন এর উদ্দেশ্যে। রাস্তায় এসে দেখলেন, মিরপুর রোডের ভীষণ যানজট। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে আছে বাস, ট্রাক ও প্রাইভেট কারের বিশাল বহর। অদূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা অটো ট্যাক্সি। ট্যাক্সির চালককে জিজ্ঞেস করলেন, মিরপুর ২নং এ হার্ট ফাউন্ডেশন যাবেন?

ট্যাক্সিচালক বললেন, যাব, তবে ভাড়া দুইশ টাকা লাগবে। দ্বিগুণ ভাড়া দাবী করলেও অগত্যা নিরুপায় হয়ে তাতে চড়ে বসলেন। সাথে দিন নিত্যকার বহনকৃত ঝুলন্ত ব্যাগ। যানজটের ভিয়ে খুবই শ্লথ গতিতে গাড়ীটি অগ্রসর হচ্ছিল। দারুস সালাম রোড অতিক্রম করে মিরপুর এক নম্বর পর্যন্ত একটুখানিক পথ পেরুতে প্রায়ই এক ঘন্টা সময় লেগে গেল। প্রিয় স্যারের সংকট জনক অবস্থা চিন্তা করে ডাক্তার রাহাতের মনটা ভীষণ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লো। তবু শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে পৌছুতে পেরে আল্লাহর শোকরিয়া জ্ঞাপন করে দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে চলে যাচ্ছিলো। এমন সময় ট্যাক্সি চালক পিছন থেকে ডাক দিয়ে বললেন, স্যার, আপনি ব্যাগ ফেলে যাচ্ছেন। ডাক্তার রাহাত এতে সম্বিত ফিরে পেয়ে ব্যাগটা হাতে নিলেন। এই ব্যাগের মধ্যেই ওর দামী মোবাইল, টাকা, বাসার চাবি। চালককে ধন্যবাদ জানিয়ে হাতে একশ টাকার একটা নোট গুঁজে দিলেন। এরপর হন্তদন্ত হয়ে হাসপাতালের সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

রাহাত ভাবতে লাগল, একবার স্যারের পায়ের হাড় ভেংগে বেশ কিছুদিন তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। তখন স্যারকে দেখতে গিয়েছিলো কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে, স্যারের নিজ বাড়িতে। তখন হার্টের অসুখ এত তীব্র ছিলো না। এখন মনে হচ্ছে স্যারের হার্ট এটাক করেছে। অতীতের স্মৃতি হাতড়ে রাহাতের মনে পড়লো এই স্যারই তার জীবনের মোড় পাল্টে দিয়েছিল। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হবার পর স্যারের সাথে পরিচয়।

CamScanner

সেই স্কুল জীবনে স্যারের অমায়িক ব্যবহার, পিতৃসুলভ ভালবাসা এবং যে কোন প্রয়োজনে স্যারের উদার সহযোগিতা ডাক্তার রাহাতের ছাত্র জীবনকে বদলে দিয়েছিল। মনে পড়ল, উচ্চ শিক্ষার প্রবেশ মুখে পিতৃবিয়োগের ফলে, যখন পরিবারের স্বজনরা তাকে কলেজে ভর্তি না করিয়ে চাকরিতে যোগদানের জন্য চাপ দিচ্ছিলো, তখন এই স্যারই তাকে বলেছিল, "বাবা, এত ভাল রেজাল্ট তোমারা এসএসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েও তুমি যদি উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে ডাক্তার হতে না পার, তাহলে আমার শিক্ষা জীবন ব্যর্থ। তোমার ভর্তির টাকা আমিই দিব। তবুও পড়াশুনা চালিয়ে যাও। হাল ছেড়ো না, প্রয়োজনে টিউশনি করো।"

অন্যমনস্ক হয়ে যখন এসব ভাবছিল, তখন মায়ের কথা মনে পড়লো। স্যারের উৎসাহ ও প্রনোদনার কথা শুনে সেদিন মা তাকে বলেছিল, 'বেঁচে থাক বাবা, তোমার চাকরি করতে হবে না। তোমার বাবা বেঁচে না থাকলেও স্যারের মত সমাজহিতৈষী লোকেরা এখনো বেঁচে আছে আল্লাহর ইচ্ছায়। একদিন তুমি বড় ডাক্তার হবে। এই দু'আ করি। সব সময় দয়াময় আল্লাহর উপর ভরসা রেখ।'
মা এখন বেঁচে নেই। অতীতের দুঃসহ স্মৃতি মনে পড়লে এখনো দুচোখ ভিজে যায়। সেদিন মায়ের দু'আ কবুল হয়েছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় রাহাত সফলভাবে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে পরবর্তীতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রী অর্জন করেছিল।

নানাবিধ চিন্তা করতে করতে রাহাত সিঁড়ি বেয়ে তিনশ চার নম্বর কেবিনের সামনে এসে দাঁড়ালো। ওয়ার্ডে গিয়ে বিস্ময়ের ঘোর কাটেনা। দেখে স্যারের দুপাশে ভিড় জমে আছে তার সহপাঠীদের অনেকে। স্যারকে পালস অক্সিমিটার ও অক্সিজেন মাস্ক লাগিয়ে ভেন্টিলেটর দিয়ে রাখা হয়েছে। তাকে দেখেও সবাই নির্বাক। প্রিয় স্যারের অসুস্থতার সংবাদ ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে দূরদুরান্ত থেকে স্যারের ছাত্ররা ছুটে এসেছে। স্যার সবাইকে ভালবাসতো জানতাম। কিন্তু দুর্দিনে সবাই এত অল্প সময়ে স্যারকে দেখতে আসবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি রাহাত। সকলে মিলে স্যারের যাবতীয় খরচ বহন করতে উদগ্রীব দেখে স্যারের মেয়ের মুখে কোন দুশ্চিন্তা ছিলোনা। স্যার অলস দেহে বিছানায় পড়ে থাকলেও সবাইকে দেখে খুশী হলো। সন্তানেরা দূরের সফর শেষে বাসায় ফিরে এলে পিতা মাতার মুখে যেরূপ দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে শুয়ে থাকলেও রাহাতকে দেখে স্যারের মুখে খুশির ভাব জেগে উঠল। উনার হাতের ইশারায় রাহাত কাছে গেলে, স্যার বললো, আমার এনজিওগ্রাম ও রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টের ফলাফল গুলো দেখে নাও।

ডাক্তার রাহাত খুব মনোযোগ সহকারে রিপোর্টগুলোয় চোখ বুলাতে লাগলো। পিছন থেকে নম্র ধরে ফাইজা বললো, আমরা এতক্ষন ধরে অধীর আগ্রহে আপনার প্রতিক্ষায় দিলাম। বাবা, বারবার বলতেছিলো, অপারেশন এর ঝুঁকি আছে কিনা? এখানকার ডাক্তারেরা প্রান খুলে সব কথা বলছে না। এই হাসপাতালের বিখ্যাত কার্ডিয়াক সার্জন ডাক্তার জাহাঙ্গীর কবির পরামর্শ দেয়েছেন ওপেন হার্ট সার্জারী করার জন্য। দয়া করে বলুন, ঐ অপারেশন করলে আব্বুর কি কি জটিলতা হতে পারে?
এতক্ষণ ফাইজার দিকে না তাকিয়ে শুধু শুনতেছিল ওর অভিব্যক্তি। ফাইজার পেরেশানি ভাব লক্ষ্য করে ওর দিকে মুখ ফিরালো রাহাত। দেখল, ওর চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ ও উৎকণ্ঠা। নেকাবে ঢাকা ওর মুখাবয়ব। সমস্ত শরীর শালীন পোশাকে আবৃত্ত ফাইজাকে দেখতে অনেক সুশ্রী মনে হলো। হাইস্কুলে পড়াকালীন ছোট থাকতে ওকে প্রথম দেখেছিল। এখন ও যে কলেজ পড়ুয়া তরুণী। রাহাত লক্ষ্য করল সবাই ওর মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে। রোগীর গতি প্রকৃতি জানবার জন্য। এখানে আশেপাশের ওয়ার্ড গুলোতে সবাই হার্টের রোগী। তাই সে নিজেকে সামলে নিলো। ফাইজার কথায় তার ভাবনায় ছেদ পড়ল।

ভাইয়া, ডিউটি ডক্টর বলেছে, অপারেশন না করলে যে কোন মৃত্যুর ঝুঁকি রয়েছে। এতটুকু বলতেই ওর চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। ও হঠাৎ অস্ফুট কান্নায় ভেঙে পড়লো। রাহাত কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ফাইজা খেয়াল করল, রিপোর্ট দেখার পরে রাহাতের কপালে চিন্তার রেখা ছুঠে উঠেছে। সে হতাশ কণ্ঠে বললো, অপারেশন না করলে হয় না?

রিপোর্ট অনুযায়ী স্যারের করোনারী ধমনিতে একানব্বই ভাগ ব্লক ধরা পড়েছে। ডায়াবেটিস রোগীর অপারেশন পরবর্তী জটিলতা থাকতে পারে। সে সবার দিকে তাকিয়ে বললো, অপারেশন এ ঝুঁকিও আছে, মুক্তিও আছে। তাই ঝুঁকিমুক্ত থাকতে অপারেশন এড়ানোর কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ রোগ দেন, তিনিই সুস্থতা দান করেন। মানুষের সুখ আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। তাই আমাদের উচিত মহান আল্লাহর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করা। অপারেশনের পরে এই হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে রোগী পাঁচ-দশ বছরের অধিক সময় বেঁচে আছে। এ নিয়ে এই হাসপাতালের অনেক সুনাম আছে।

রাহাতের বক্তব্য শুনে জাইজার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বিছানায় শুয়ে থাকা হাশিম স্যারও শুনে নিশ্চিন্ত হলো অপারেশন এর ব্যাপারে। স্যারের গুণমুগ্ধ ছাত্রদের আগমনে ওর মধ্যে জেগে উঠল কৃতজ্ঞতাবোধ। সে সবার উদ্দেশ্যে বললো, আপনাদেরকে এই সংকটময় মুহূর্তে বাবার পাশে

CS CamScanner

আমি অনেকটা দুশ্চিন্তা মুক্ত। আপনাদের আন্তরিকতা আমি কখনো ভুলবো না। আগামীকালই অপারেশন করতে হলে তিন ব্যাগ সতেজ রক্ত ব্লাড ব্যাংকে আজকের মধ্যে জমা রাখতে হবে এবং তিনজন রক্তদাতা রেডি রাখতে হবে। যাদের ব্লাডগ্রুপ এ পজেটিভ, তারা করোনা ভাইরাস মুক্ত সনদ দেখিয়ে রক্ত দাতা হতে পারবেন। এই চাহিদা ও শর্ত পূরণ না করলে আগামীকালের অপারেশন সিডিউল অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

ওর কথা শুনে কিছুক্ষন কেটে গেলো পিনপতন নীরবতায়। স্তব্ধতা কাটিয়ে রাহাত সবার আগেই ঘোষনা দিল, সে রক্ত দাতা হতে পারবে। ওর দেখা দেখি আরও তিন-চার জন সায় দিল রক্ত দিতে। তখন ফাইজার মুখে ফুটে উঠলো অনাবিল হাসি। ও মনে মনে মহান আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলো। দেখতে দেখতে রাত প্রায় এগারোটা বেজে গেল।

সিদ্ধান্ত হল, পরের দিন সকালে অপারেশনের সুবিধার্থে তিনজন রক্তদাতার রক্ত সংগ্রহ করে ব্লাড ব্যাংকে রাখতে হবে এবং দু'জন রক্তদাতাকে আগামীকাল রাত আটটায় অপারেশনের সময় অপেক্ষাগারে থাকতে হবে।
এরপরে সবাই যার যার অবস্থানে চলে গেল।
হার্ট ফাউন্ডেশনের পিছনে একটা বিল্ডিংয়ে স্বল্প মেয়াদি ঘর ভাড়া নিয়ে স্যারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনরা সেখানে অবস্থান করছিলেন। অপারেশন বাবদ প্রায় তিন লাখ টাকা প্রয়োজন। বিদেশ থেকে স্যারের দুই জন ছাত্র সব টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে স্যারের একাউন্টে। স্থানীয় যারা ঢাকা শহরে অবস্থান করছে তারাও আশ্বাস দিয়েছে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা করার।
দুই দিন ধরে অনেকটা নির্ঘুম কাটিয়ে ফাইজার শরীর খুবই ভেংগে পড়েছে। ক্লান্তি ওর দুই চোখ জুড়ে। এমতাবস্থায় বাসায় যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো। এমন সময় বাপের অস্পষ্ট আওয়াজ শুনে পিছনে ফিরে তাকাল। মনে হল, আব্বু কাঁদছে। ও দৌড়ে বাবার মাথায় হাত রেখে বলল, আব্বু, কোন দুশ্চিন্তা করো না। আম্মু, জায়নামাজে বসে সারাক্ষণ কাঁদছে আর দু'আ করছে। আল্লাহ চায় তো আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবেন, ইনশাআল্লাহ।

সন্তানকে আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হতে দেখলে পিতা- মাতা দারুণ খুশী হয়, এই ভেবে যে, আমার অবর্তমানে আল্লাহই তাদের রক্ষা করবেন। স্যারের মনে হল, একমাত্র মেয়ের ভবিষ্যৎ কারো উপর তুলে দিতে পারলে তিনি নিশ্চিন্তমনে ঘুমাতে পারতেন। নার্স এসে ক্যানুলা দিয়ে স্যারের শরীরে হার্ট ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণকারী ঔষধ ও ঘুমের ঔষধ দিয়ে গেলো। এমন সময় ডাক্তার রাহাত কর্তব্যরত একজন চিকিৎসক সাথে নিয়ে হাজির হলো।

ফাইজা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ভাইয়া, আপনি এখনও যাননি? ওর কথায় কর্নপাত না করে রাহাত বললো, এ হচ্ছে ডাক্তার ইরফান, আমার সহপাঠী। স্যারের কথা ওকে বলেছি। রাতে এসে স্যারকে দেখে যাবে। একদম দুশ্চিন্তা করবে না। এখন বাসায় গিয়ে বিশ্রাম কর। রাহাতের কথায় মৃদু হেসে ফাইজা কেবিনের দরজার দিকে পা বাড়াল। তখন রাহাত ওর সামনে চোখের দিকে চেয়ে রইল। মেয়েটার মায়াভরা চাহনি ওর হৃদয় কেড়ে নিল, যেন কর্তব্যের তাগিদে নিজেকে সামলে নিয়ে দ্রুত স্যারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, অপারেশন টিমের প্রধান সার্জনদের সাথে আমি দেখা করেছি। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে যাবেন।

স্যার খুশি হয়ে বললো, বেঁচে থাক বাবা, তোমার দায়িত্ব অনুভূতি আমাকে খুবই মুগ্ধ করেছে। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুক। স্যারের দু'আ নিয়ে রাহাত কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল।

মহান আল্লাহর বদান্যতার শেষ নেই। যারা আর্ত মানবতার সেবায় নিয়োজিত তিনি তাদেরকে অনুগ্রহ করেন। রোগীর সেবার মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি দুটোই পাওয়া যায়া আল্লাহর অগনিত নিয়ামতের মধ্যে সবচেয়ে দামী হচ্ছে সুস্থতা ও নিরাপত্তা। কারণ, অসুস্থ না হলে মানুষ কখনো সুস্থতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। প্রিয় স্যারের সংকটময় মুহূর্তে সেবা করতে পারায় রাহাতের মনটা খুশিতে আত্মহারা।

CS CamScanner

রম্য রচনা

ডিম! ডিম!! ডিম নিক্ষেপ!!!

ডা. মোঃ এহাসানুল হক
সহকারী অধ্যাপক
ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগ, চমেক

রাজনীতিতে বা বিক্ষোভে ডিম নিক্ষেপ একটি পুরোনো এবং প্রতীকী প্রতিবাদ। সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই প্রবণতা বাড়লেও, এর ইতিহাস বহু পুরোনো এবং বৈশ্বিক। কেবল একটি সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে এটি কীভাবে প্রতিবাদের শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছে, তা দেখবার বিষয় বটে। আর দলীয় বিরোধী শক্তির প্রতি ক্ষোভ দেখাতে বা আদালত প্রাঙ্গণে আসামিদের উপর প্রতিবাদ জানাতে ডিম নিক্ষেপের ঘটনাইবা আসলো কোথা থেকে।

ডিম, যা সাধারণত রান্নাঘরে ব্যবহার হয়, তা প্রতিবাদ ও রাজনৈতিক মঞ্চে একটি প্রতীকী অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। এর কারণ হলো এটি সস্তা, সহজলভ্য এবং খুব দ্রুত দৃশ্যমান প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। বিশেষ করে টমেটো বা ডিম ফেটে গেলে দৃশ্যটি আরও নাটকীয় হয়, যা প্রতিবাদের ক্ষোভ এবং বার্তা সহজে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক অ্যান্ড্রু গেলম্যান এই ধরনের খাদ্য নিক্ষেপকে ব্যাখ্যা করে বলেন, এটি একটি অহিংস প্রতিবাদ। ডিম বা টমেটো নিক্ষেপ করলে পুলিশের পক্ষে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ জনমনে তা 'ফুলিস' বা হাস্যকর বলে মনে হতে পারে। ফলে এই প্রতিবাদের একটি প্রতীকী মূল্য আছে, যা পুলিশি বল প্রয়োগের ঝুঁকি কমায়।

সব মিলিয়ে, ডিমের মাধ্যমে প্রতিবাদ শুধু ক্ষোভের প্রকাশ নয়, এটি একটি কার্যকর, সস্তা এবং দ্রুত নজর কাড়ার মাধ্যম। ইতিহাস জুড়ে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ, যেমন কৃষক, শিক্ষার্থী এবং কর্মীরা এই সহজ উপকরণটিকে প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

রাজনীতিতে ডিম নিক্ষেপ একটি প্রচলিত প্রতিবাদ বা অবমাননার প্রতীকী কর্মকাণ্ড। এটি বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে। আসুন বিস্তারিত জেনে নেই।

রাজনীতিতে ডিম নিক্ষেপের অর্থ ও উদ্দেশ্য

১. প্রতিবাদ প্রকাশ:
এটি রাজনীতিবিদ, দল বা তাদের নীতির বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ ও প্রতিবাদ প্রকাশের একটি সরাসরি এবং দৃশ্যমান উপায়।

২. অবমাননা ও অপমান:
ডিম নিক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিবাদকারীরা লক্ষ্য ব্যক্তিকে জনসমক্ষে অপদস্ত ও অবমানিত করতে চায়।

৩. মনোযোগ আকর্ষণ:
এমন একটি কর্মকাণ্ড যা মিডিয়া এবং জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নির্দিষ্ট ইস্যু বা অভিযোগের উপর আলোকপাত করে।

ডিম নিক্ষেপের ইতিহাস বহু পুরনো। মধ্যযুগে বন্দিদের ওপর জনসম্মুখে ডিম ছোড়ার কথা শোনা যায়।

বিখ্যাত কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাবলী:

- লিখিত সূত্রে এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮শ শতকের গোঁড়ার দিকে।

১৮৩৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসত্ববিরোধী বক্তা জর্জ হোয়াইটারকে ডিম ছোড়ার ঘটনা নথিভুক্ত আছে।

- ১৯১৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী বিলি হিউজকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়।

- অস্ট্রেলিয়ায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জন হাওয়ার্ড ১৯৯০-এর দশকে বেশ কয়েকবার ডিম নিক্ষেপের শিকার হয়েছিলেন।

- ২০০১ সালে ব্রিটিশ উপ-প্রধানমন্ত্রী জন প্রেসকটের দিকে ডিম নিক্ষেপের ঘটনা, যেখানে তার প্রতিক্রিয়ায় ঘুষি দেওয়ার ছবিটি বিশ্বজুড়ে আলোড়ন তৈরি করেছিল।

- ◆ **জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জুনিচিরো কোইজুমি:**
  ২০০৫ সালে এক ব্যক্তি তার গাড়ির দিকে ডিম নিক্ষেপ করেছিলেন।
- ◆ **বাংলাদেশেও বিভিন্ন সময়ে:**
  রাজনৈতিক সমাবেশ বা বিচারপতি হওয়ার পর বিচারপতিদের গাড়িবহরে ডিম নিক্ষেপের ঘটনা পত্রিকার কলাম এ প্রকাশিত হয়েছে, যা প্রায়শই রাজনৈতিক সংঘাতের ইঙ্গিতবহ।

আইনি দিক

ডিম নিক্ষেপ একটি "আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র" কর্মকাণ্ড মনে হলেও এটি গুরুতর আইনি পর্যালোচনা হতে পারে:

◆ হামলা (Assault/Battery): এটি শারীরিক আক্রমণের শামিল হতে পারে, মরণঘাতী আঘাত যদি ও না হয়।

◆ জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করা: শান্তিপূর্ণ সমাবেশে বিঘ্ন সৃষ্টি করার অপরাধে মামলা হতে পারে।

◆ ক্ষতিপূরণ: ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পোশাক বা সম্পত্তির ক্ষতি'র জন্য মামলা করা যায়।

একটি রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে মূল্যায়ন

◆ কার্যকারিতা:

অনেক বিশ্লেষক এটি প্রতিবাদের একটি অপরিণত ও হিংগ্র রূপ, যা প্রায়শই প্রতিবাদকারীর কারণের প্রতি সহানুভূতি কমিয়ে দিতে পারে।

◆ জনসমর্থন:

সাধারণ মানুষ এটিকে অশোভন ও অগণতান্ত্রিক হিসেবে দেখতে পারেন, যা প্রতিবাদকারীদের বিচার / আইনের আওতায় আনার পক্ষে যুক্তির দাবী রাখে।

CamScanner

ভ্রমণ কাহিনী:
পাশের সিটের যাত্রী

ডাঃ কাজী মোহাম্মদ ইস্রাফীল
সহকারী অধ্যাপক
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল ইউনিট।
২৪তম বিসিএস স্বাস্থ্য

ফ্লাইট টাইম সকাল ৭.৪৫ মি:, খুবই টেনশনে আছি ৭.০০ টার মধ্যে এয়ারপোর্টে পৌঁছতে হবে। বউয়ের হাতের এক কাপ চা খেয়ে বের হতে হলে কমপক্ষে ৬.০০ টায় ঘুম থেকে উঠতে হবে। রাত জাগা অভ্যাস সেই মেডিকেল লাইফ থেকেই। সকালে যত কাজ থাকুক না কেন রাত ১ টার আগে ঘুম আসে না। রাতে খুব একটা ভাল ঘুম হলো না। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম ফ্লাইটে ওঠেই একটা ঘুম দিবো। যথারীতি বহির্গমনের সমস্ত ফরমালিটি সেরে বিমানে গিয়ে আমার সিটে বসলাম। আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কানে হেডফোন লাগিয়ে মাথাটা হেলিয়ে একটু চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করলাম। পাশে একজন ৫৮/৫৯ বছরের ভদ্রলোক আসন গ্রহণ করলেন। সিট বেল্ট বাঁধার ঘোষণা পেয়ে ভদ্রলোক সিটবেল্ট খুঁজছেন। উনাকে ভদ্রতার খাতিরে একটু সিটবেল্ট পরতে সহযোগিতা করলাম। এর পর উনি উকিল জেরা শুরু করলেন, কি নাম, কি করি, কোথায় থাকি, ছেলে মেয়ে কয়জন, কোনটা কিসে পড়ে, ভাবী কি ডাক্তার, ভাবী কি করে? এ রকম নানাবিধ প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছিলাম। খুব বিরক্ত নিয়ে ভদ্রতার খাতিরে প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়ে যাচ্ছি অনিচ্ছা সত্ত্বেও। যে মাত্র শুনলেন আমি দাঁতের ডাক্তার, অমনি উনার সব দাঁতের সমস্যা শুরু হয়ে গেল। পিজি হাসপাতালের এক ডাক্তারের নাম বললো, তার অধীনে চিকিৎসা নিচ্ছেন কিন্তু বলে যাচ্ছেন ডাক্তার টা ভালো না, ভালো ভাবে রোগী দেখেন না, স্মার্ট ছেলে সারাদিন হাসপাতালে মেয়েদের নিয়ে গল্প আড্ডায় কাটিয়ে দে, রোগীদের প্রতি যত্নশীল না। আমি বললাম, নাতো! সে তো এমন ছেলে না। ভালো ছেলে, আপনি কি তাকে চিনেন? হ্যা যাঁ চিনি। তাহলে একটু বলে দেন না আমাকে একটু ভালো ভাবে যেন দেখে দেয়, আর টাকাটা যেন একটু কমিয়ে রাখে। আমার তিনটা দাঁতে রুট ক্যানেল করে ক্যাপ করতেছে, আমার নাম অমুক, আমি অমুক সংস্থার ডিডি। লোকটার ক্রমাগত অনুরোধে সকাল ৭.৫৩ মিনিটের সময় সে ডাক্তারকে ফোন দিলাম। তার ওয়াইফ ফোনটা পিক করে বললো ভাইয়া ওতো একটু অসুস্থ, ঘুমাচ্ছে। মনেহয় আমার ফোনের শব্দে তার ঘুমটা ভেঙে গেল, সে ফোন নিয়ে বললো ভাইয়া আমি এক্সিডেন্ট করে হাত ভেঙে ফেলেছি, এখন প্লাস্টার করে রেখেছি। আমি বললাম অমুকের চিকিৎসা তুমি পিজিতে করতেছো, একটু দ্রুত সময়ে পারলে করে দিও। ডাক্তার সাহেব বললো ঠিক আছে ভাইয়া। এবার দেখি উনি রাজনৈতিক আলাপ শুরু করে দিয়েছেন। ড. ইউনুস সাহেব মনে হয় ইলেকশন দিবেন না, আপনি কি মনে করেন? আমি বললাম এটা তো আপনারাই ভালো জানেন কারন আপনারা বড় বড় পোস্টে চাকুরী করেন। উনি তখন বললেন ড. ইউনূস সরকার কেমন? আমি বললাম মানুষের সেটিসফিকশান মাপার কোন যন্ত্র আমার জানা নেই।

তবে আপনি কি টাইপ-১ ইরোর (Type-1 Error) এবং টাইপ-২ ইরোর (Type-2 Error) সম্বন্ধে কিছু জানেন?

না জানলে শুনুন।

দুটো ছাত্র একটি পেশাগত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। একজন খুব ভালো পরীক্ষা দিয়েছে, ৯০ এর উপরে নম্বর পেয়ে পাশ করবে। আরেকজন কোন রকম জাস্ট অংশগ্রহণ করেছে, টেনেটুনে ৩০/৩৫ পেতে পারে। পরীক্ষা শেষে মূল্যায়নের জন্য পাঠানো হলো শিক্ষকের কাছে। শিক্ষক সমাজবদ্ধ জীব, সংসারে সুন্দরী বউ আছে, মাঝে মধ্যে দুইজনের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হয়, সেই দিন ও বউয়ের সাথে একটু মনোমালিন্য হওয়ার পরে পরীক্ষার খাতা দুটো মূল্যায়ন করতে বসলেন। প্রথমেই যে ভাল পরীক্ষা দিয়েছে সেই খাতাটা কাটলো, সমানে কেটে কেটে মনের সকল রাগ মিটালো ছেলেটার খাতার উপরে, ছেলেটাকে ফেল করিয়ে দিল, যেহেতু মন মেজাজ খারাপ ছিল, বউয়ের সাথে ঝগড়ার কারণে।

কতক্ষণ আর বউয়ের সাথে ঝগড়া করে কথা না বলে থাকা যায়, বউ এককাপ চা বানিয়ে নিয়ে এসে স্বামীর পাশে বসে, এতে শিক্ষকের রাগ গলে রোমান্টিক মুডে সুঁইয়ং করে। খুব ফুরফুরে মেজাজে দ্বিতীয় খাতাটি কাটতে বসে, এখন যা পড়ে সবই ভালো লাগে আর সমানে নম্বর দিতে থাকে। এতে ছেলেটি অনেক ভালো নম্বর পেয়ে যায়। যথারীতি রেজাল্ট বের হল, দেখা গেল ভালো পরীক্ষা দেওয়া ছেলেটি ফেল করেছে আর অন্যজন পাশ করেছে। ফেল করা ছেলেটি রেজাল্ট দেখে খুব বিস্মিত হয়, রাগে দুঃখে ছেলেটি স্যারকে গুলি করার জন্য একটি গান (বন্দুক) কিনে এটি হল Gun Error বা টাইপ-১ ইরোর। অন্যদিকে খারাপ পরীক্ষা দেওয়া ছেলেটি খুব খুশি, গার্ল ফ্রেন্ডকে বলে, তুমি শুধু আমাকে মূল্যায়ন করলে না, দেখো স্যার কিন্তু ঠিকই আমার কদর বুঝেছে, চলো স্যারকে ফুল দিয়ে প্রনাম করে আসি। এটি হল ফ্লাওয়ার ইরোর মানে টাইপ-২ ইরোর।

এখন আপনিই কম্পেয়ার করেন, কোনটি ভাল আর কোনটি খারাপ।

লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম কিছুই তিনি বুঝেননি, সবই উনার মাথার উপর দিয়ে গেছে। ততক্ষণে ফ্লাইট গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ায় বেচারার শেষ পরিনতি দেখতে পেলাম না। শুধু দেখলাম বেচারা টাইপ-১ ইরোর আর টাইপ-২ ইরোর ঝপতে ঝপতে হারিয়ে গেল।

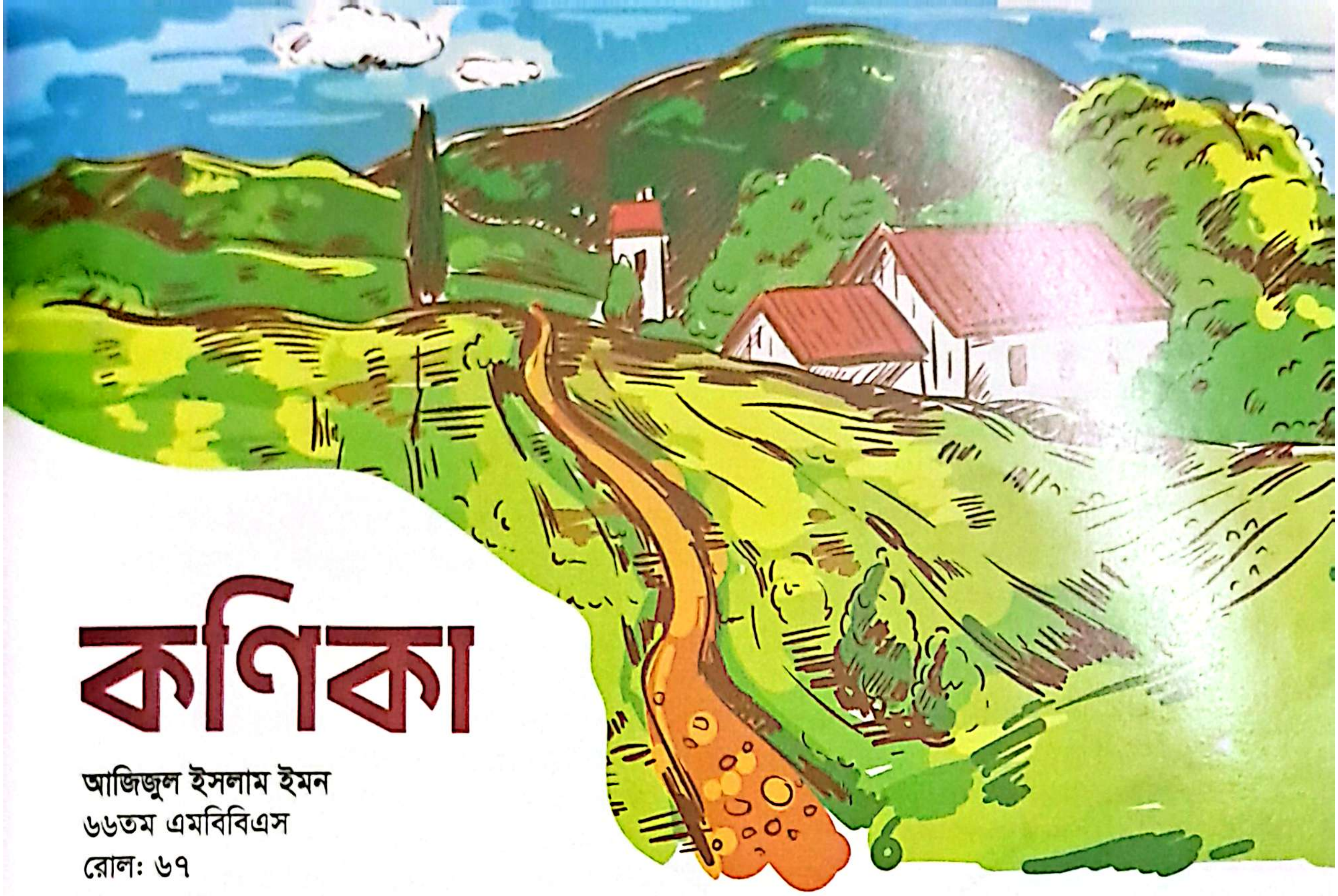

কণিকা

আজিজুল ইসলাম ইমন
৬৬তম এমবিবিএস
রোল: ৬৭

১৯ জুলাই' ১৯৭৮

আমি স্বপ্ন, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করে মাত্র ঢাকা কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। আব্বু ঢাকায় সরকারি চাকরি করেন, কোনো এক কারণে তার বদলি হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের লামা মহকুমার আলীকদম থানায়। মাতামুহুরীর তীরে ছোট্ট একটা বসতি আলীকদম। সমতল থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন।
বদলির নোটিশ আসার পর থেকেই আব্বুর চেহারাটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আব্বু কোনোভাবেই রাজি ছিল না আলীকদম আসার জন্য। তবে বদলি কনফার্ম হওয়ায় চলে যেতেই হবে। আব্বু অবশ্য অনেক চেষ্টা করেছেন ক্যানসেল করার, তবে রিটার্নিং নোটিশ আসতে কমপক্ষে তিনমাস লাগবেই। তাই ত্রিশ তারিখে আমাদের শিফট হয়ে যেতে হবে, এক তারিখ থেকে আব্বুর জয়েন।

৩০ জুলাই' ১৯৭৮

চকরিয়া শহরে আসলাম মাত্র। তবে আরো অনেকটুকু পথ যেতে হবে পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে। ওয়ান ওয়ে সরু উঁচু নিচু, পথ, চারপাশে খাদ। এ এক ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য প্রকৃতির। মানসিক প্রশান্তির সাথে ভয় রাস্তা এক মিশ্র অনুভূতি। আব্বুর মন খারাপ কেন জানি না। আম্মু বলেছিলেন, আব্বুর প্রথম পোস্টিংও আলীকদমেই ছিল। পুরনো জায়গা তো ভালো লাগারই কথা, আমার তো খুবই ভালো লাগছে। চারপাশের পাহাড়ের অপরূপ সৌন্দর্য্যে ডুবে থাকতে মোটেও বিরক্ত লাগছেনা। হঠাৎ চৈক্ষ্যং ইউনিয়নের কোনো এক জায়গায় এসে আমাদের গাড়ির ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গেল। আব্বু কেন জানি অনেক বেশি ঘামছে। আশেপাশে ঠান্ডা বাতাস আমার ভালোই লাগছে, তো আব্বু ঘামছে কেন? আব্বু তো এখানে অনেকদিন ছিল, সব রাস্তাঘাট চেনার কথা, ভয় পাওয়ারও কথা না! আম্মু এবার জিজ্ঞেস করেই বসল "তোমার কি হয়েছে? পোস্টিংয়ের পর থেকেই তোমাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে। এখন আবার এই ঠান্ডায় ঘেমেই যাচ্ছ, তুমি কি কোনো কারণে চিন্তিত? আমরা তো তিনমাস পর রিটার্ন করবই। "আব্বু উপেক্ষার সুরেই বলে "তেমন কিছুই না, এমনি" হঠাৎ একটা লোককে দেখলাম আমাদের দিকে আসছে। লোকটার চেহারা মঙ্গোলয়েডদের মতো। পাহাড়ের মানুষের চেহারা এরকম হয় শুনেছি, এই প্রথম নিজ চোখে দেখলাম। উনি এসেই আব্বুকে বললেন "সৌরভ মিয়া কোয়ার্টারে যাইবেন নাকি? তিনশত পাঁচ নং বাসাটা তো অনেকদিন কেউ খুলে নাই, কণিকার সব এখনো ওখানেই লুকানো আছে ? মুক্ত করবেন না তারে?" আব্বু সেই যে লোকটাকে দেখে চোখ বড় করে তাকিয়ে ছিলেন, চোখের পলক এখনো পড়েনি। মনে হচ্ছিল যেন অন্য গ্রহে চলে গেছেন।

লোকটা কথাটা বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে হেঁটে চলে গেল সামনে। আব্বুকে বললাম "লোকটাকে চিনেন নাকি?"
আব্বু হুঁশ ফিরে পেলেন। বললেন "চিনি তো, আগে যখন এখানে ছিলাম তখন থেকে পরিচয়"।
আবার জিজ্ঞেস করলাম " কণিকা কে?"
আব্বু বিব্রত হয়েই বললেন "ওনার মেয়ে ছিল। এসব বাদ দাও, তুমি জেনে কি করবে?"
তাই তো, এসব নিয়ে আমি কি করব। কিন্তু মেয়ে ছিল মানে কি, এখন নাই ? আমি মনে হয় বেশিই চিন্তা করছি।
এতরাতে লোকটা কোথায় যাচ্ছে একা, এটা ভেবে ঐ দিকে তাকাতেই দেখি লোকটা নাই। এত দ্রুত কোথায় যেতে পারে?
মনে মনে ভাবলাম, "ওরা পাহাড়ি লোক, সব চিনে, হয়তো আশেপাশের পরিচিত কোথাও গেছে।"
আব্বু বললেন "গাড়িটা তো বন্ধ হয়ে গেল। এখন কি করব? আরেকবার ট্রাই করে দেখি, নাহলে অফিসে কল দিয়ে গাড়ি পাঠাতে বলতে হবে। "
অথচ আশ্চর্য সর দেখলাম, গাড়ি ঠিকই আছে তাহলে হঠাৎ তখন বন্ধ হওয়ার কারণ কি?
যাইহোক রাত দুইটার দিকে আমরা আলীকদম পৌছালাম। আজকে রুম গোছানো সম্ভব না, তাই রেস্টরুমেই থাকলাম।

১ আগস্ট, ১৯৭৮

সকালে নাস্তা সেরে আমি ক্যান্টনমেন্ট ঘুরে দেখছিলাম। ভালোই সুন্দর, তবে বেশী বড় না! এক পরিচারিকা এসে আব্বুকে চাবি দিয়ে বললেন, "আপনাদের জন্য তিনশ পাঁচ নম্বর বাসাটা পরিষ্কার করে দিয়েছি স্যার। একটা রুমের চাবি পাইনি, ঐটা বাদে বাকি জায়গা আমি পরিষ্কার করেছি, আপনারা উঠে যেতে পারবেন এখন।"
একটু অবাক হলাম আমি। কালকে লোকটাও সেইম তিনশ পাঁচ নম্বর বাসার কথাই বলেছিল। উনি আগে থেকেই জানলেন কিভাবে আমরা এখানেই উঠব? মাথায় কিছুই ঢুকছিল না।
আব্বু মহিলাটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে কিছু বখশিশ দিয়ে দিলেন। আমরা জিনিসপত্র নিয়ে উঠে পড়লাম বাসাটাতে।
পুরোনো আমলের বাসা হলেও ডিজাইনটা সুন্দর। বেলকনি থেকে একটু দূরে একটা গ্রাম দেখা যায়। ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম।
আব্বুকে কেন জানি কাল থেকে আরো বেশি অস্থির লাগছিল। সন্ধ্যায় একটা পাহাড়ি লোকের সাথে আব্বু কদম গাছটার নিচে কথা বলছিল। কথার মধ্যে কেমন একটা অনুনয়ের সুর ছিল। আমি একটু দূরে থাকার কারণে কি বলেছে তা শুনতে পাইনি। রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা শুয়ে পড়ি। রাত দুইটার দিকে হঠাৎ প্রকৃতির ডাকে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। পাশে দেখি আব্বু নাই! আব্বু কোথায় গেল? আমার পাশেই তো ছিল! আব্বুকে খুঁজতে রুমের বাইরে গিয়ে দেখি বন্ধ রুমটা থেকে আব্বু বের হচ্ছে। এই রুমের চাবি তো আমাদের ছিল না, আব্বু কোথায় পেল?
আব্বু আমাকে খেয়াল করেনি। আমি তাড়াতাড়ি এসে শুয়ে পড়লাম।

২ থেকে ১৫ আগস্ট, ১৯৭৮

এই কয়েকদিনে আব্বুর কপালে চিন্তার ভাঁজ বেড়েই চলেছে। প্রতিদিন আব্বু ঐ বন্ধ রুমটাতে গিয়ে কি যেন খোঁজে! আমার মনে হচ্ছিল ঐ রুমটাতে কিছু একটা তো আছে, যার কারণে আব্বু প্রতিদিন ঐ রুমে যায়!

১৬ আগস্ট, ১৯৭৮

আজকে আবারো পাহাড়ি লোকটা কদমতলায় আব্বুর সাথে দেখা করতে এসেছে। আমি চুপি চুপি আড়াল থেকে শুনার চেষ্টা করলাম। লোকটাকে আব্বু জিজ্ঞেস করেছিল তারিখ জানতে পেরেছে কিনা।
উনার উত্তর ছিল এরকম "কণিকার ছাইটা এখনো নিগ্রহ কক্ষেই রাখা। আগামী ১৯ তারিখ ২০ বছর পূর্ণ হবে তার মৃত্যুর। তখন ওটাকে কৃষ্ণশঙ্খে মাতামুহুরীর জলে ভাসানো হবে"
আব্বুর উত্তরটা ছিল এরকম "নাহ, আমি কোনোভাবেই এটা হতে দিব না। ওর ছাই শ্বেতশঙ্খেই ভাসানো হবে। আমার শেষ প্রায়শ্চিত্ত আমি করবই।"
আমি ঘটনা কিছুই বুঝিনি, তবে এটা আঁচ করতে পেরেছি যে আব্বু অনেক কিছু এতদিন আমাদের থেকে লুকিয়েছিল। কিসের পাপ, কিসেরই বা প্রায়শ্চিত্ত?
আমি লোকটার পিছু নিলাম। দেখলাম লোকটি একটা মন্দিরের মত জায়গায় ঢুকে গেল। এটা অনেকটা বৌদ্ধ মন্দিরের মত, তবে মন্দির কিংবা বৌদ্ধমন্দির কোনোটাই না, একটু অন্যরকম!

আমি উঁকি দিয়ে দেখলাম, ভিতরে নীল ছাদরে জড়িয়ে এক বৃদ্ধ উপাসনা করছে, মুভিতে দেখা ট্র্যাডিশনাল ধর্মগুরুর মতো মনে হল!

আমার মনে হলো উনি এদের ধর্মগুরু। পাহাড়ি লোকটা যেহেতু এখানেই ঢুকেছে, উনারা হয়তো অনেক কিছুই জানে। আমি ভিতরে যাব কিনা কনফিউজড ছিলাম। তবে আসল ঘটনা কি আমাকে জানতেই হবে। এই নেশায় ঢুকেই পড়লাম উপাসনালয়ে। উনি আমাকে দেখে অনেকটা আদরের সুরেই আমাকে পাশে বসালেন। কথার ফাঁকে জানতে পারলাম উনিশ তারিখ নাকি তাঁদের মহাশোকের দিন। বিশ বছর আগে এদিন তাঁরা তাঁদের স্বর্ণমূর্তিটি হারিয়ে ফেলেছিলেন। আগামী উনিশ তারিখ বিশ বছর পূর্ণ হবে এবং প্রতারককে নরকে উৎসর্গ করে তাঁরা নতুন স্বর্ণমূর্তির অভিষেক করবেন।

এটা অনেকটা ওদের ধর্মীয় নিয়ম যে, স্বর্ণমূর্তি যুগ যুগ ধরে একটা পরিবারের হাত ধরেই সংরক্ষণ করা হতো। বিশ বছর আগে কণিকা এই দায়িত্ব পেয়েছিল, কিন্তু কণিকা এই মূর্তি বিক্রি করে তার দায়িত্বের সাথে প্রতারণা করেছিল। শাস্তি হিসেবে ধর্মীয় নিয়মেই তাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয় এবং তার ছাই বিশ বছরের জন্য নিগ্রহকক্ষে বন্দি করা হয়। তার পরিবারকে বিশ বছর সময় দেওয়া হয়, হারিয়ে যাওয়া মূর্তিটি ফেরত আনতে পারলে এই ছাই শ্বেতশঙ্খেই ভাসানো হবে, আনতে না পারলে কৃষ্ণশঙ্খে ভাসিয়ে নরকে পাঠানো হবে!
তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস শ্বেতশঙ্খে ভাসালে সে স্বর্গে যাবে, কৃষ্ণশঙ্খে ভাসালে নরকে যাবে।
কণিকার পরিবার স্বর্ণমূর্তি ফেরত আনতে না পারার কারণে তারা একঘরে হবে এবং কৃষ্ণশঙ্খে কণিকার ছাই ভাসানো হবে।
ঘটনাটা আমার কাছে অনেকটাই করুণ ও রহস্যময় মনে হলো।
মেয়েটা যখন জানে এই নিষ্ঠুর নিয়ম, সে বিক্রি করল কেন মূর্তিটা? নাকি ঘটনা অন্য কিছু?
আমার হিসেব কোনোভাবেই মিলছিল না। আব্বু কেন এ বিষয়ে এত চিন্তিত? আব্বুর সাথে কণিকার কি সম্পর্ক ? সত্যিটা আসলে কি?

১৮ আগস্ট, ১৯৭৮
বরাবরের মতোই রাতে আব্বু বন্ধ রুমটাতে কি যেন খুঁজছেন। আমি রুমে ঢুকে আব্বুকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, "আব্বু আপনাকে প্রতিদিন এই রুমে আসতে দেখি। এখানে আপনি কি খোঁজেন?"
আব্বু বললো "স্বপ্ন তুই এখানে? আরে তেমন কিছু না। তুই না ঘুমাচ্ছিলি, হঠাৎ এখানে?"
আমি বলেই দিলাম, “আপনি আমার থেকে কিছু লুকিয়ে লাভ নাই, আমি আপনাকে কদমতলায় পাহাড়ি লোকটার সাথে কথা বলতে শুনেছি। তখন আমি ওর পিছু পিছু মন্দিরে গিয়ে পুরোহিতের কাছেও কণিকার ব্যাপারে জেনেছি!”
আব্বু এবার নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারলেন না। আব্বু কেঁদে ফেললেন, হয়তো অনেকদিনের চাপা কষ্টে। তারপর বলতে শুরু করলেন " আমার প্রথম পোস্টিং ছিল এখানে। আমার সাথে আরেকজন ছিল দিনাজপুরের শুভ্র। প্রায় তিন বছর একসাথে এখানেই ছিলাম। শুভ্র কোনোভাবে জানতে পেরেছিল, অদূরের ঐ গ্রামটাতে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ থাকে। তাদের কাছে কোটি টাকা মূল্যের এক স্বর্ণমূর্তি সংরক্ষিত আছে ধর্মীয় প্রতীক হিসেবে। তখন মূর্তি যে কক্ষে সংরক্ষিত ছিল তার চাবিটা সংরক্ষণের দায়িত্ব ছিল কণিকার । শুভ্র মেয়েটাকে ধীরে ধীরে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে চাবিটা চুরি করে নিয়েছিল। পরে সে স্বর্ণমূর্তি চুরি করে এই কক্ষেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছিল। মূর্তিটা সংরক্ষিত ছিল সেই জায়গায়, যেখানে আমাদের গাড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কয়েকদিন পর জানাজানি হয় স্বর্ণমূর্তি চুরি হয়ে গেছে। কণিকা বুঝেছিল এটা শুভ্র করেছে, কিন্তু সে তাকে কিছুই বলেনি! শুভ্র হয়তো লোভের বশবর্তী হয়ে প্রেমের অভিনয় করেছিল, কণিকা সত্যি সত্যিই তাকে ভালোবেসে ফেলেছিল। কণিকা এই আক্ষেপে নির্দ্বিধায় জ্যান্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের একটু চেষ্টাও করেনি।
এই ঘটনার পর শুভ্র তড়িঘড়ি করে ব্যাগ গুছিয়ে নিজের বাসায় চলে গিয়েছিল। যদিও মূর্তিটা এখানেই রেখে গিয়েছিল, নিতে পারেনি। সে মূর্তিটা এখানে কোনো এক বাক্সে লুকিয়েছিল। এক বছরের ভিতরেই শুভ্র আত্মহত্যা করেছিল। তার পরিবারের কেউ জানতো না কেন সে চাকরি ছেড়েছিল, কেনই বা সে আত্মহত্যা করেছিল। এই পুরো রহস্যটা আমার হৃদয়ে এতদিন ধরে দুনিয়া থেকে আড়াল করে রেখেছিলাম।

আমিও কয়েকদিনের মধ্যেই বদলি নিয়ে নিলাম। শুনেছিলাম চৈক্ষ্যংয়ের ঐ জায়গাটাতেই কিছুদিন পর কণিকার বাবা কন্যার শোকে মারা যান । এরপর আর এ বিষয় নিয়ে ভাবিনি।
হঠাৎ আলীকদম পোস্টিং হওয়ায় আমার পুরনো ঘটনাগুলো মনে পড়ছিল। আমি চাইলেই সত্যিটা সবাইকে বলে মেয়েটাকে বাঁচাতে পারতাম। কিন্তু, তখন আমার কাছে মনে হয়েছিল বন্ধুর জীবনটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আমার সেই ভুল সিদ্ধান্ত আমাকে ভিতর থেকে মেরে ফেলছে। শেষে হলেও আমি উনিশ তারিখের আগে মূর্তি ফেরত দিয়ে তার আত্মার স্বর্গগমন নিশ্চিত করতে চাই। হয়তো এর জন্য একটু হলেও প্রায়শ্চিত্ত হবে। দুনিয়ায় যে ক্ষোভ নিয়ে ও বিদায় নিল, সে যেন ঐপারে গিয়ে সুখে থাকে।
এখানে আসার পর প্রতিদিন আমি মূর্তিটা খুঁজেছি, কিন্তু খুঁজে পাইনি এখনো। তোমরা জেনে যাবে এই ভয়ে ভালো করে খোঁজা হয়নি মূর্তিটা। আজ আর কোনো ভয় নাই, আমি আমার প্রায়শ্চিত্ত করবই।"
আমি আর আব্বু অনেক খোঁজার পর মূর্তিটা পেয়েছি।
রাতেই আব্বু মূর্তিটা ধর্মগুরুর কাছে ফেরত দিয়ে আসে, সাথে একটা চিঠিতে সকল সত্যি বলে দেয়।

১৯ আগস্ট, ১৯৭৮
আব্বুর মুখে এখন আর আগের মত চিন্তার ভাঁজ নেই। অনেকটাই তাকে খুশি দেখাচ্ছে।
কণিকার মূর্তি আজ শ্বেতশঙ্খে ভেসে মাতামুহুরীর স্বচ্ছ জলের ধারায় স্বর্গ গমন করবে। কিন্তু সে যে অপ্রাপ্তির তৃষ্ণায় পরপারে গেল, সে কি আদৌ মিটবে। হয়তো হ্যাঁ, হয়তো না।

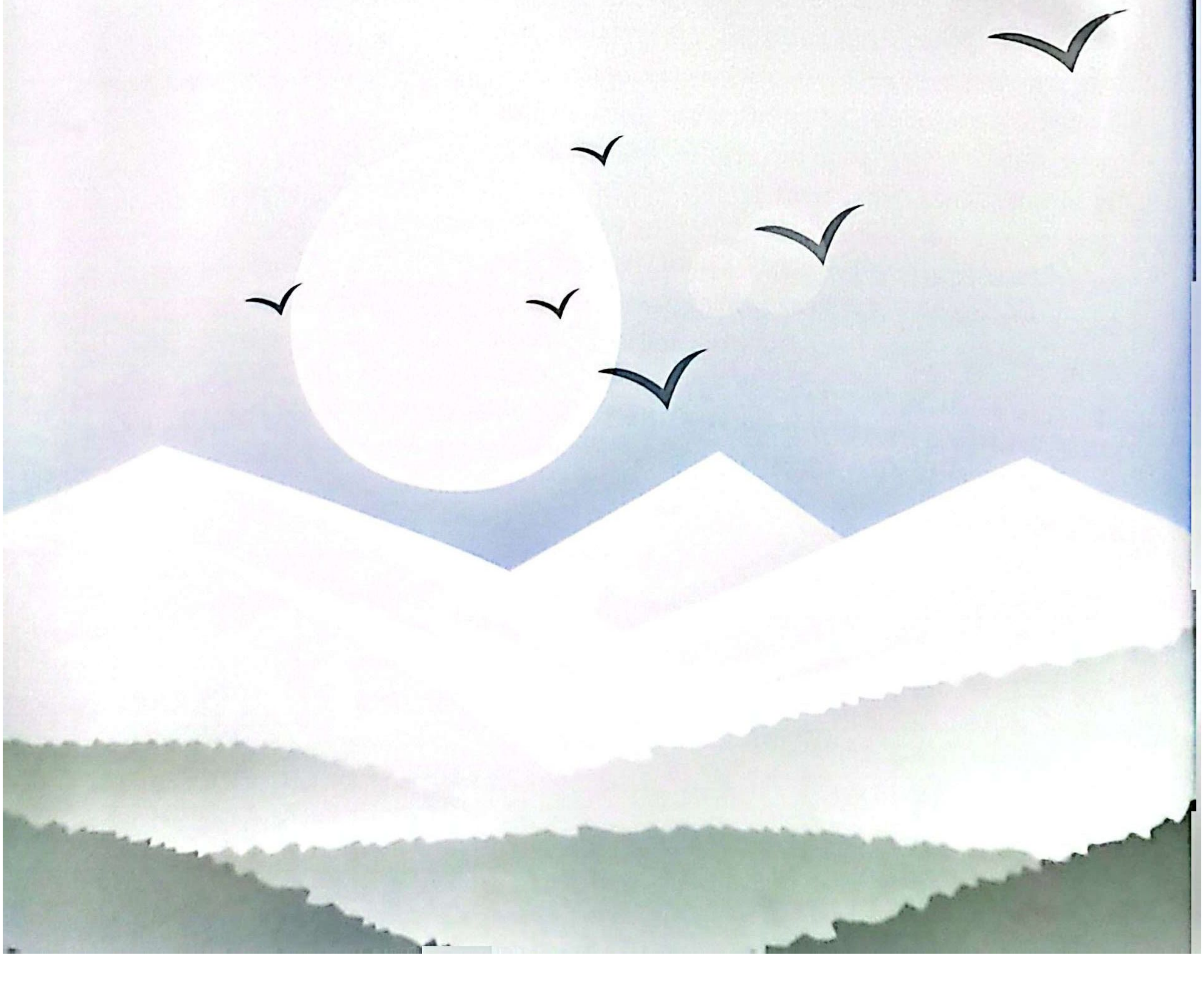

ভ্রমণ সাহিত্য

পাহাড়ে আকাশী প্রশান্তি

আমজাদ হোসেন সিফাত
৬৬তম এমবিবিএস

১৭-১৮ ডিসেম্বর ২০২৪

ব্যস্ত শহরের হাঁফ ধরা একঘেয়েমী এবং লেকচার, টিউটোরিয়ালের অসহনীয় বিরক্তি জীবনকে যখন ক্রমাগত নিষ্প্রাণ করে তুলছিল, তখন ভাবলাম এবার একটু প্রকৃতির কাছে যাই।

আমরা আটজন- তানিম, আলভি, স্বরূপম, ইমতিয়াজ, রাশফিক, আশফি, ইমন আর আমি। গন্তব্য বান্দরবান, যেখানে মেঘেরা পাহাড়কে আলিঙ্গন করে আর মানসপটে ছড়িয়ে দেয় প্রশান্তির পরশ। পাহাড়ের রুক্ষতা, অরণ্যের সজীবতা, হ্রদের নীলিমা আর মেঘের অভ্যর্থনা সবই যেন একই ফ্রেমে ধরা দেয় এখানে।

ভ্রমণের শুরু:

শীতের এক রৌদ্রজ্জ্বল সকালের বেলা ৮ ঘটিকার সময় চট্টগ্রামের নতুন ব্রিজ থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। শহর পেরিয়ে যখন গাড়ি চকরিয়ার দিকে এগোতে লাগল, দূর পাহাড়ের রেখারা যেন হাতছানি দিয়ে বলল, "এসো, হারিয়ে যাও আমাদের বুকে।" চকরিয়া পৌঁছে চান্দের গাড়িতে পাহাড়ি পথে যাত্রা শুরু করলাম। চারপাশে সবুজ পাহাড়ের মুগ্ধতা আর নিচে গভীর উপত্যকার রহস্যময়তা-সব মিলিয়ে যেন এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা। একসময় এসে পৌঁছলাম মিরিঞ্জা বাজারে।

মিরিঞ্জা ভ্যালি:

মিরিঞ্জা বাজার থেকে নির্ধারিত রিসোর্টের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম। উঁচুনিচু সরু পথ, দুপাশে গভীর খাদ, সামনে দিগন্ত ছোঁয়া পাহাড়-সব মিলিয়ে পথ যেন এক বিভীষিকা । ক্লান্তি পিছু টেনে ধরলেও থামিনি আমরা। হঠাৎ দূরে দেখা মিলল জুমঘরের, ছবির মতো সাজানো, অথচ পৌঁছানো যেন এক সাহসিকতার পরীক্ষা। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে পাহাড়ি খাড়া-সর্পিল পথ মাড়িয়ে অবশেষে পৌঁছালাম কাঙ্খিত রিসোর্টে।

দুপুরের আহার শেষে বিকেলে সূর্যাস্তকে ক্যামেরাবন্দী করলাম। রঙে রঙে রাঙানো পাহাড় যেন নিঃশব্দে কবিতা পাঠ করছিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে আকাশে তারার মিছিল দৃশ্যমান হলো। তারাদের আয়োজনে যেন ধীরে ধীরে জীবন্ত হয়ে উঠছিল নিশিরাত। সন্ধ্যায় বার্বিকিউ পার্টির সেশনটা দারুণ ছিলো।আর মাঝরাতের ট্রুথ এন্ড ডেয়ার আড্ডা-যেখানে আলোচনার সূত্রে জীবন, দর্শন, ধর্ম, বিজ্ঞান-সবই ঘুরে এল। পাহাড়ের রূপালি চাঁদের আলো যেন সব কিছুকে ঢেকে দিলো এক অভাবনীয় নীরবতায়। জুমঘরের পাটাতনে সেই রাতের রাত্রিযাপন হৃদয়ে কুয়াশার মতো থেকে যাবে চিরকাল। সকালে, কুয়াশায় মোড়া পাহাড় যেন এক নতুন রূপে জেগে উঠল। শিশিরস্নাত পাতা আর ধীরে জেগে ওঠা সূর্যের মুখচ্ছবি, সবই তুলে নিলাম ক্যামেরায়। এরপর রওনা হলাম মেঘলা ও নীলাচলের পথে।

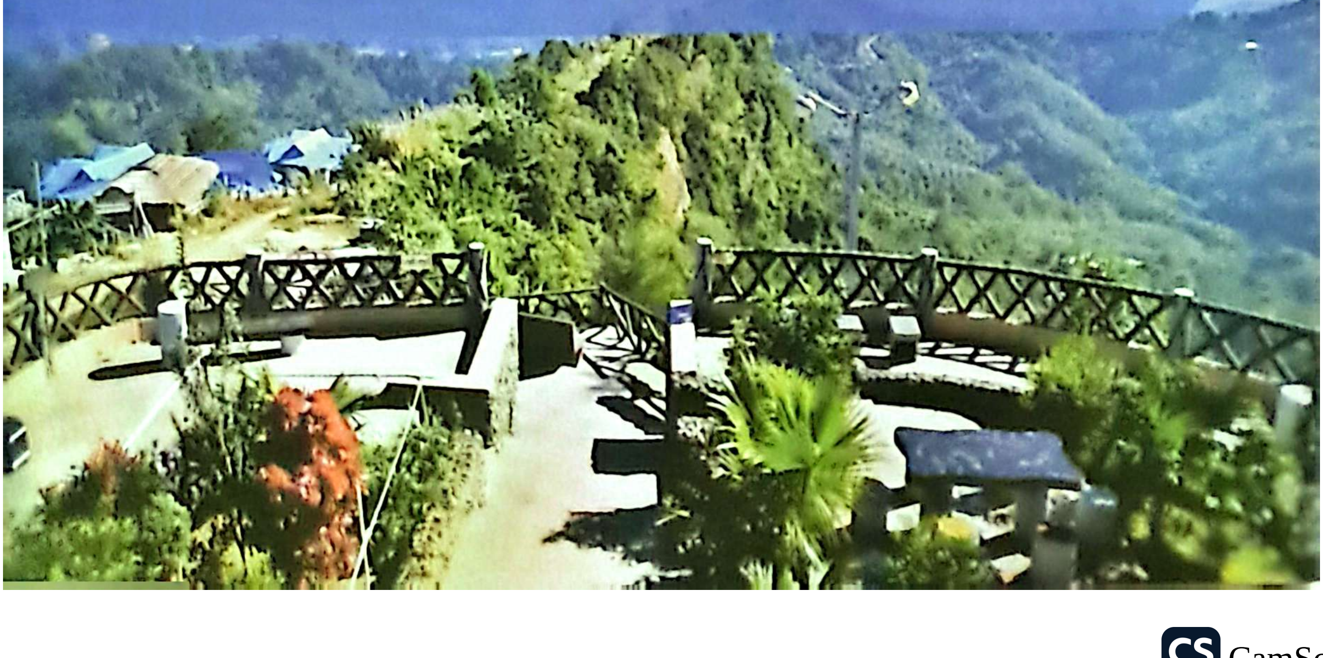

CamScanner

মেঘলা ও নীলাচল:

এই পর্ব যেন আরও এক অধ্যায়, যেখানে প্রকৃতির তুলিতে আঁকা হয়েছে আরেকটি রঙিন উপাখ্যান। আবার চান্দের গাড়িতে যাত্রা শুরু, এবারের গন্তব্য মেঘলা রিসোর্ট। কিন্তু এবারের পাহাড়ি পথটা আগের চেয়ে আরো বেশি উঁচুনিচু ছিলো, প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল গাড়িটা এই বুঝি ছিটকে যাবে, হারিয়ে যাবে পাহাড়ি উপত্যকার বুকে। কিন্তু গাড়ি ছিটকে পড়ার ভয়কে উপেক্ষা করে এ মুহূর্তে গাড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে, বন্ধ দুচোখে, প্রসারিত দুহাতে পরিশ্রান্ত মন নিয়ে পাহাড়কে নিবিড়ভাবে অনুভব করার বিষয়টাই মুখ্য হয়ে উঠেছিল। এ সময়টা যেন স্বপ্নে হেঁটে চলা বাস্তবতা আর কল্পনার সীমারেখায় দাঁড়িয়ে থাকা মুগ্ধ এক ক্ষণ। মেঘলায় পৌঁছে চোখে পড়ল একটি বিস্তীর্ণ হ্রদ, যার নীল জলরাশি মনকে টেনে নিয়ে যায় নির্জনতায়। নৌকা ভ্রমণ, ট্রেকিং, ক্ষুদ্র চিড়িয়াখানা-সব মিলিয়ে ছিল এক অপার আনন্দের ভান্ডার। সেখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আমরা যাত্রা করলাম নীলাচলের দিকে।

নীলাচল, নামের মাঝেই যেন এক কবিতার ছন্দ। নীলাদ্রি পয়েন্ট, শাপলা পয়েন্ট, নবঅঙ্গন, নীলাম্বরী কটেজ-সবই যেন একেকটি প্রকৃতির রঙতুলি। চিম্বুক পাহাড়ের অসীম বিস্তার যেন দৃষ্টির শেষে মিলেছে আকাশের কোলে। সূর্য্যের আলো পাহাড়ের গায়ে রঙ তুলেছে প্রেমের ছোঁয়ায়। সেই সৌন্দর্য হৃদয়ে যে শিহরণ জাগাল, তা ভাষায় বর্ণনাতীত।

সব কিছুতে যেন এক অপার্থিব সৌন্দর্য, যখন এসবের দিকে গভীরভাবে তাকাই, তখন মনে হয়, এত নিখুঁত ভারসাম্য, এত মনকাড়া সৌন্দর্য নিছক কাকতালীয় হতে পারে না। এই সময়টায় কুরআনের একটাই আয়াত অন্তরের গভীরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, "হে আমাদের রব! আপনি এসব অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আপনি পবিত্র, আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।"-(সূরা আলে ইমরান ৩:১৯১)

পথে পথে চলতে গিয়ে দেখেছি অপরিচিত গাছ, নাম না জানা ফুল, আদিবাসীদের সরল জীবনের প্রতিচ্ছবি। এই মানুষগুলোর কাছে জীবন এত সহজ, এত অনাড়ম্বর! সুখ বলতে শুধু দু'বেলা পেটপুরে খাওয়া আর শান্তিতে বেঁচে থাকা। অথচ আমাদের অতিরিক্ত চাহিদা আর অহেতুক ব্যস্ততা আমাদের জীবনকে করে তুলেছে জটিল ও ক্লান্তিকর। নিজেদের অতিরিক্ত চাহিদাগুলো সীমাবদ্ধ করতে পারলে, বিলাসী মনোভাবকে বিদায় জানাতে পারলে অতি সহজেই সন্তুষ্টচিত্তে কাটিয়ে দেওয়া যায় আস্ত একটা মানব জীবন।

পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বিলীন করে দিয়ে গাছপালা আগুনে পুড়িয়ে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন রিসোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। হয়তো ভ্রমণপিপাসুদের থাকা-খাওয়ার ভালো বন্দোবস্ত হচ্ছে এবং একশ্রেণির মানুষ ঠিকই লাভবান হচ্ছে। কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে নির্মল প্রাকৃতিক ভূমিগুলো। এসব ভূমির আত্মচিৎকার হয়তো পরিবেশবাদীদের কানে পৌঁছায় না কিংবা পরিকল্পিতভাবেই থামিয়ে দেওয়া হয়েছে পাহাড়ের হাহাকারগুলো। মানুষের সৌন্দর্যপিপাসা মিটাতে এভাবেই নিজেদের বিসর্জন দিয়ে যাচ্ছে পাহাড়গুলো।

ফিরে আসা:

ফিরতি পথে সূর্য অস্তমিত হচ্ছিল লালচে আকাশের আঁচড়ে, গল্প আর হাসিতে কেটে যাচ্ছিল মুহূর্তগুলো। বান্দরবান বাস টার্মিনালে এসে রাতের বাসে উঠে পড়লাম। বিশাল এক বাস জার্নি এক ঘুমেই পার করে দিয়েছি। লম্বা একটা পথ পাড়ি দিয়ে নিজেকে আবিষ্কার করলাম জংধরা সেই পুরনো জীবনে রুটিনে।

প্রকৃতির কোলে কিছু সময় কাটিয়ে বুঝেছি- জীবনের সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে সরলতায়, প্রশান্তিতে। ক্লান্ত মনকে নতুন উদ্যমে জাগিয়ে তোলার জন্য কখনো কখনো হারিয়ে যেতে হয় পাহাড়ের বুকে, মেঘের ছায়ায়, আর নির্জনতায়। বান্দরবান শুধু এক দর্শনীয় স্থান নয়, এটি যেন হৃদয়ের পরিশুদ্ধির এক আশ্রয়স্থল।

পাহাড়ি উপত্যকায় জীবন এখনো সেই পুরনো প্রাকৃতিক নিয়মে যাপিত। পাহাড় গুলো তাই পরিচ্ছন্ন পরিপাটি। এখানে কয়েকদিনের জন্য হারিয়ে যাওয়া যেন এক প্রকার নেশার মতো। এক প্রশান্তির নেশা। ভাল থাক পাহাড়গুলো। সুখে থাকুক পাহাড়ি মানুষগুলো।

CamScanner

A Chilling Yet *Magical Journey* to Nepal

Sarjil Mahmud Khan
65th MBBS
Roll 115

Back in November 2016, I went on a trip that I'll never forget with my parents, to the beautiful and mountainous country of Nepal. It was cold, crisp, and the skies were perfectly clear, ideal for the kind of adventure we were about to have.

We started in Kathmandu, a city that felt like stepping into a living museum. The streets were packed with life locals going about their day, the scent of incense drifting from temples, and ancient buildings standing strong through centuries of history. Walking through Durbar Square, I remember feeling both awed and a little overwhelmed by how much culture was packed into every corner.

Then we headed to Dhulikhel, a quieter, more peaceful place nestled in the hills. I still remember standing on a hillside, wrapped in warm clothes, watching the sunrise paint the Himalayan peaks in gold. The sunsets were just as magical fiery colors melting into the mountains. It was the kind of silence that made you feel small in the best way.

One afternoon, we visited Kathmandu University. The campus was calm, surrounded by greenery, and had a peacefulness that made it feel almost like a retreat. I remember thinking, "What a beautiful place to study." Next, we traveled to Pokhara, and wow what a place Calm lakes, mountain views from every angle, and this slow, easy rhythm of life. We'd wake up early just to catch the sunrise over the Annapurna range, shivering but grinning as the sky turned orange.

And then came the biggest moment of the trip: a helicopter ride to see Mount Everest. Watching the mighty peak rise through the clouds from up above it gave me chills, and not just from the cold.

This trip wasn't just sightseeing. It was moments with my parents, shared silence under Himalayan skies, and memories I'll hold onto forever. Nepal, with all its natural beauty and soul, left a mark on me and I hope someday, I'll get to return.

CS CamScanner

মনবৃষ্টি

মোছাম্মৎ সামিহা খানম
৬৪তম এমবিবিএস
রোল: ১৬৯

সময় চলে, সাথে জীবন পাল্টে যায়। আর জীবন পাল্টানো মানে আপনার জীবনে যাবতীয় সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সবকিছু পাল্টে যাবে। একসময় আপনি হয়তো অল্পতেই কেঁদে উঠতেন। আর এখন আপনি অল্পতে কাঁদেন না ঠিকই কিন্তু আগের তুলনায় হয়তো অধিক কষ্ট পান। আগে আপনি ঘুরে-বেড়ানো, নিজের শখ-আহ্লাদ পূরণে ব্যস্ত হতেন আর এখন? এখন আপনি আপনার পুরনো রূপকে খুঁজে পেতে চান, কঠিন বাস্তবকে তরল করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালান।কখনো বা হাঁপিয়ে ওঠেন, কাঁদেন। সহ্য-সীমা আগের চেয়ে বহুগুণে যেমন বেড়েছে, ঠিক তেমনই একটি নতুন শব্দ যোগ হয়েছে জীবনের সাথে। তা হলো 'ডিপ্রেশন'।

এই মুহূর্তে আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন- কোন ব্যাপারটিকে আমি ভয় পাই এবং এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। আমি উত্তরে বলব 'ডিপ্রেশন'। কারণ, আমার মত যারা নিজের গভীর কষ্ট কাউকে বলতে পারেনা এমনকি কখনো যদি 'ডিপ্রেশন' শব্দটির সঙ্গে বাস্তবে সাক্ষাৎ হয়ে যায়, তখনো নিজেই আপ্রাণ চেষ্টা চালায় এ থেকে বাঁচতে -তারা জানে এটি নিছক কোনো শব্দ নয়, এটি এক কথায় আপনার জীবনের সকাল থেকে সন্ধ্যা প্রতিটি মুহূর্তকে জ্বালাময়কারী হাতিয়ার।

যাই হোক, সময় পাল্টাবে, জীবন পাল্টাবে, জীবনের গতিময়তা পাল্টাবে ঠিকই কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি শব্দটির সাক্ষাৎ পাবেন। এবং আপনি কোনো আশা দেখবেন না, অতিরিক্ত চিন্তা ভেতর থেকে আপনাকে হত্যা করার চেষ্টা করবে। কিন্তু না! আপনি এক্ষেত্রে সঠিক নন। 'ডিপ্রেশন' এর চোখ দিয়ে আপনি নিরাশ হবেন ঠিকই কিন্তু সাধারণভাবে যদি ভেবে দেখেন- আপনার চারদিকেই হতাশার অসংখ্য রেখা থাকলেও একদিকে কিন্তু ঠিকই আশার একটি সম্পূর্ণ সহজ পথ তাকিয়ে রয়েছে আপনার দিকে। আর তা হলো -আপনার সঠিক ধর্ম। এমন নিরাশ অবস্থায় আপনি একদিন শুধু সম্পূর্ণরূপে ইসলাম পালন করে দেখুন, প্রতি ওয়াক্ত মোতাবেক নামাজ পড়ে দেখুন, প্রতি মোনাজাতে কেঁদে দেখুন, সঠিক পথেই যেন আপনি চলতে পারেন- এই বলে আল্লাহর কাছে হাত পেতে দেখুন। আমি আমার জীবন এর শিক্ষা থেকে বলছি, আপনি কেমন যেন এক স্বস্তি বোধ করবেন। প্রতিবার আল্লাহকে ডাকার পর এক ধরণের আনন্দ বোধ করবেন। নিরাশাগুলো একে একে আপনা আপনি কেটে যাবে, আপনি বুঝতে পারবেন। হঠাৎ একদিন নিরাশাগুলো উঁকি দিয়ে দেখতে চাইবে, কিন্তু এত আশার মাঝে নিরাশাগুলোর ঠাঁই হবেনা। কারণ আপনি এখন বিচ্ছিরি ঐ শব্দ হতে মুক্ত, আপনার প্রতিপালক আপনাকে কিভাবে তা হতে বের করে নিয়েছেন আপনি বুঝবেনই না। তবে উপলব্ধি করতে পারবেন!

নিঃশ্বাসে মৃত্যু
জুলাইয়ের এক অলিখিত উপাখ্যান

আবরার আল ফয়সাল সিয়াম
৩১ তম বিডিএস

ষোলই জুলাই, মঙ্গলবার, ২০২৪।
উত্তপ্ত দুপুর। ওয়ার্ডে রোগী সামলে বের হতেই সেদিন প্রাই আড়াইটা।
বের হয়েই প্রথমে চকবাজার মোড়ে চলে আসি। গায়ের এপ্রোন খোলা হয়নি তখনো। সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলামনা কি করবো? সকাল থেকেই বিভিন্ন ভাবে আঁচ করতে পারছিলাম আজ চট্টগ্রামের আন্দোলন হয়তো নতুন মোড় নিবে। নির্দেশ ছিলো মুরাদপুর-ষোলশহরের দিকে তিনটার আগেই দ্রুত মুভ করার জন্য। পরিস্থিতি তখনো থমথমে। বাতাসও যেন নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গেছে। অজানা আতঙ্ক চারপাশে। চকবাজারে এসে কয়েকজন ভাইয়ের সাথে একত্রিত হতে হতে প্রায় পৌন দুইটা। সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি যা হওয়ার হবে, আজকে স্পটে যাবোই। না খেয়েই আমরা কয়েকজন তখন সিএনজি নিয়ে দ্রুত রওনা দিই মুরাদপুরের দিকে। ঠিক ২.৫৫ এর আশে পাশে মুরাদপুর মোড় তখন সন্ত্রাসীদের দখলে ছিলো। দূর থেকে দেখলাম ওরা দুয়ের বেশি জনকে একসাথে দেখলেই মারতে আসতেসে। ওদের হাতে দেশীয় অস্ত্র, রামদা, চাপাতি আর লাঠি। চোখে মুখে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ওরা হয়তো আমাদের চোখের শাহাদাত প্রাপ্তির বিপ্লবী চেতনা দেখতে পাইনি। প্রমোদ গুনলাম। বিপদ অতিআসন্ন। ওরা সিএনজি আর অটো থেকে সবাইকে চেক করে করে নামাচ্ছিলো। সামনের পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে আমরা সিএনজি থেকে একশ মিটার আগেই নেমে গেলাম। পরে সবাই যার যার অবস্থান থেকে আলাদা হয়ে দূরত্ব রেখে চলতে শুরু করি। ক্লাস শেষ করে বের হওয়ায় কাঁধে তখনো ব্যাগ ছিলো। আশে পাশে পাথর আর ইটের টুকরো যা পাচ্ছিলাম সবগুলো দিয়ে ব্যাগে পূর্ণ করছিলাম তখন।

উদ্ভূত পরিস্থিতি দেখে মনের অজান্তেই তখন মনে মনে শাহাদাতের নিয়ত করে ফেলেছি আমি। থেমে থেমে আমাদের অবস্থান চেইঞ্জ হচ্ছিলো। একবার খাওয়া তো আরেকবার পাল্টা ধাওয়া। আনুমানিক চারটা বিশ মিনিটের দিকে সন্ত্রাসীরা মুরাদপুর ওভারব্রিজের পাশে মসজিদে বেলালের ছাদের ওপর থেকে আমাদের ওপর থেকে হট পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে।

আমাদের কয়েকজন ভাই তীব্রভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয় তখন। তাদের হসপিটালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে একযোগে ওদের ধরার জন্য সবাই বদ্ধ পরিকর হয়ে যাই আমরা। খুব বেশি হলে আধঘন্টা, এর মধ্যেই ওদের মসজিদ থেকে বের করে আনতে সক্ষম হই। একটু পরপর বিভিন্ন বিভিন্ন যায়গা থেকে আহত ভাইদের রক্তাক্ত চেহারাগুলো সামনে আসছিলো। ওয়ার্ড থেকে আসার সময় আমি ব্যাগে কিছু সংখ্যক ফাস্ট এইড সামগ্রী, ব্যান্ডেজ, আর গজ নিয়ে আসি। এগুলোর সঠিক ব্যবহার করতে দ্বিতীয়বার আমার ভাবতে হয়নি আর। চারটার কিছু সময় পর প্রতিরোধ আর সংঘর্ষের একটা পর্যায়ে এসে, মুরাদপুর মোড়ের একটু সামনে গলির মধ্যে আমাদের কয়েকজন ভাই আটকে পড়ে। তাদের উদ্ধার করতে আরেকদল যায় ভিতরে। গলির ওপর থেকে বিভিন্ন বিল্ডিং এর ছাদ থেকে সন্ত্রাসীরা ইট আর পাথর নিক্ষেপ করছিলো তখন সমানো আকস্মিক ইটের আঘাতে আমার ঠিক দুইহাত সামনে দু'জন ভাইয়ের মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে শুরু করে। আরেকজন ভাইয়ের সাহায্য নিয়ে দ্রুত ব্যান্ডেজ দিয়ে মাথা বেঁধে সিএমসি তে পাঠিয়ে দিই তাদের। তাৎক্ষণিক ফোন দিয়ে একজন ইন্টার্ন ভাইকে বলে রাখি ওদের কথা। মুহুর্মুহু গুলি আর সাউন্ড গ্রেনেডের শব্দ ভেসে আসছিলো মুরাদপুর ষোলশহরের রোড থেকে। এরই মধ্যে খবর পাই, কয়েকজন ভাই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে নিয়েছে। আমাদের তখন মাথায় রক্ত ওঠে এসেছে। সাড়ে পাঁচটার দিকে একটা ইটের টুকরা আমার কোমড়ে এসে পড়েন সাময়িক কিছুটা যখন হই আমি। আহত হয়ে আমি বসে পড়ি তখন। আশে পাশে যারা হিলো দ্রুত আমাকে এক পাশে ধরে নিয়ে আসে। পরবর্তীতে পানি খেয়ে কিছুটা সুস্থতাবোধ করি আলহামদুলিল্লাহ। কাছের একজন বন্ধু কল দিয়ে জানালো সন্ত্রাসীরা তীর বেপরোয়া হয়ে ওঠেছে। ওরা গুলি করতে করতে সামনে আসছে। আমি যেন সেইফ থাকি। এর মধ্যেই আমি সিদ্ধান্ত নিই, মর্গে গিয়ে আহত, নিহতদের অবস্থা দেখে আসবো।আমার মেডিকেলের ইমার্জেন্সি তখন স্বজনদের আহাজারীতে ভারী হয়ে ওঠেছিলো। পরে শুনেছি, সন্ত্রাসীরা মির্জাপুল, দুইনম্বর গেইট, বহদ্দারহাট মোড়সহ আলফালাহ গলিতে অসংখ্য শিক্ষার্থীদের মারধর করে।

গাড়ি থেকে নামিয়ে স্টুডেন্ট আইডি কার্ড যার কাছে পেয়েছে তাকেই নৃশংসভাবে মারা হয়েছিলো সেদিন। মেডিকেল স্টুডেন্ট পরিচয় দিয়ে আমরা দুজন মর্গে ঢুকি। ভিতরে তখনো শহীদ ফয়সাল আহমেদ শান্ত ভাই, শহীদ ওয়াসিম ভাই আর শহীদ ফারুক ভাইয়ের লাশ ছিলো। লাশগুলো দেখে নিজেকে স্থির রাখা সম্ভব ছিলোনা আমাদের পক্ষে। নিথর দেহগুলো যেন তাদের পরম প্রভুর সাক্ষাতের জন্য তন্তব্যস্ত। আমরা সময় নষ্ট না করে দ্রুত বেরিয়ে পরি। আমি আহত নিহতদের সংখ্যার একটা প্রাইমারি এজাম্পশন নার্সরুম থেকে জেনে নিয়ে বের হয়ে পড়ি । সেদিন ওয়ার্ড থেকে বের হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকেছিলাম অনেকক্ষন। ভাবছিলাম এই শহীদদের কি মনে রাখবে জাতি? আমার প্রশ্নের উত্তর আমি বোধহয় পেয়ে গেছি। "আমাদের শহীদেরা সবচেয়ে বড় সম্পদ, রেখে গেছে সাহসের দ্বিধাহীন সোজাপথ"। তারা দুনিয়ায়ও সম্মানিত, রবের কাছেও সম্মানিত, ইনশাআল্লাহ।

ফুটনোট: এই লিখাটি যখন লিখছি তখন মাথার উপরে বড় পূর্ণিমার চাঁদ। বয়েজ হোস্টেলের ছাদের এক কোনায় ছোট্ট ল্যাম্প জ্বালিয়ে বসেছি। উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলো যেন আরো জ্বলজ্বল করছে। সবকিছু কেমন যেন ঝিম ধরে আছে। আচ্ছা আমরা কি শহীদদের ত্যাগ ভুলে যাবো? যারা নিজেদের জীবনটাই দিয়ে দিলো আমাদের নতুন বাংলাদেশ উপহার দিতে। আমি উত্তর খুঁজে পাইনা। উত্তরে প্রত্যাশায় আমার কলমও এগিয়ে চলে।

গানে-কবিতায় ফিরে দেখা: আমাদের জুলাই

আজিজুল ইসলাম ইমন
৬৬তম এমবিবিএস
রোল: ৬৭

হায়দার হোসেনের 'আমি চিৎকার করে কাঁদিতে চাহিয়া করিতে পারিনি চিৎকার' সময়ের ব্যবধানে আরও একবার প্রাসঙ্গিক হয়ে এলো বাংলাদেশে। "নির্মমতা কতদূর হলে জাতি হবে নির্লজ্জ"-এ শব্দটির যে এত জ্বালা, এ প্রজন্মের মানুষ আমরা তরুণেরা জীবনে প্রথমবার সজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করে তা উপলব্ধি করলাম। আজ মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। আমাদের যাদের বলার ভাষা নেই, কিংবা বলার ক্ষমতা নেই অবাক অবাধ্য আক্রোশে আমরা যারা বাকরুদ্ধ আমাদের সকলের হৃদয়ের গহীন থেকে কণ্ঠনালীতে আটকে যাওয়া ভাষ্যের যথার্থ প্রতিফলন এই পংক্তিমালা।

সঙ্গীত কিংবা সাহিত্যের সার্থকতা এর সময়োত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যেই। যে লেখনী, যে সুর বারবার প্রাসঙ্গিক হয়ে ফিরে আসে আমাদের না-প্রকাশ-করা ভাবগুলোকে ভাষা দিতে, তাই তো একটি জাতির সাহিত্যাকাশে আসল ধ্রুবতারা। এ দাবি আরও যথার্থতা পায় যুদ্ধ কিংবা জাতির ক্রান্তিকালে লিপিবদ্ধ গান, কবিতা ও অন্যান্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে। একই সাথে এ সংকলনগুলো আমাদের এটাও মনে করিয়ে দেয় সাহিত্য মহিমান্বিত হয় নিদারুণ দুঃখ, যন্ত্রণা আর প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে অর্জিত আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে।

চব্বিশের বাংলাদেশে নতুন করে আবার সেই গানগুলোর প্রয়োজন পড়েছে, সেই কবিতাগুলো ফিরে এসেছে, যেগুলো এককালে ছিল এদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মানুষের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। আন্দোলনের স্লোগান, লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা। আবার সেই রক্তে উন্মাদনা জাগানো গানগুলো বাজছে, এবার আর অলিতে গলিতে মোড়ের চায়ের দোকানে, গৃহস্থের বৈঠকখানায় রেডিওতে নয়, বাজছে আমাদের বুকের ভেতর। স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় দিবস ব্যতীত এ গান-কবিতাগুলো যে একদিন আবারো জাতীয় চেতনার উৎসারণের কাজে লাগবে, হয়ে উঠবে প্রতিবাদের প্রতীক, তা নিকট অতীতেও বোধহয় আমরা অনুমান করতে পারিনি সংস্কার যে ধ্বংস ছাড়া সম্ভব নয় তার জীবন্ত প্রমাণের মধ্য দিয়ে আমরা হেঁটে গিয়েছি। যে আন্দোলন ছিল সংস্কারের আন্দোলন, মাত্র কয়েকটি দিনের ব্যবধানে তা ধ্বংসের আন্দোলনে পরিণত হলো। ফ্যাসিবাদের ধ্বংস, জরাজীর্ণ শাসনতন্ত্রের ধ্বংস।
ধ্বংস আমাদের চারপাশকে ঘিরে রাখা সেসকল দেয়ালের, যে মসৃণ খাঁজবিহীন দেয়ালে বাধা পেয়ে ফিরে যেত নতুন দিনের আলো, যে দেয়ালের মাথায় কাঁচের টুকরো চকচক করতো, পেরিয়ে যেতে গেলেই হতে হতো রক্তাক্ত কিংবা হাজার ফুট উচ্চতা থেকে পড়ে নির্ঘাত মৃত্যু।

ধ্বংস সেই লোহার শিকলের, যার গ্রন্থিতে বাঁধা পড়ে বহুদিন নিশ্চল ছিল এ জাতি। ধ্বংস সেই গলা টিপে ধরা হাতগুলোর, হককথা বলতে গেলেই যাদের বজ্রমুষ্টি চেপে বসে শ্বাসরোধ করত আমাদের।

আমরা প্রতিদিন তিলেতিলে মানবাধিকারের মৃত্যু দেখেছি। মিথ্যার পর্বতের পেছনে সত্যের সূর্যকে ডুবে যেতে দেখেছি। মানুষের বিবেকের সৎকার হতে দেখেছি। অপার সম্ভাবনাকে আত্মহত্যা করতে দেখেছি। একটা সময় গোয়েবলসের মিথ্যাকে বারবার পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমে তাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করার মতোই এসকল অনাচারের অবাধ চর্চা আমাদের চোখে স্বাভাবিক হয়ে গেল। আমরা এসব নিয়েই বেঁচে থাকতে শুরু করলাম। সজ্ঞানে কিংবা অজান্তে আমরা অনেকেই নিজেদেরও সেভাবে অভিযোজিত করতে শুরু করলাম। অন্যায়-অনাচারের এমন 'স্বাভাবিকীকরণ' জাতি হিসেবে আমাদের অস্থিমজ্জায় ঢুকে গেল। আমরা ভাবতে লাগলাম, কী হবে বলে? কী হবে প্রতিবাদ করে? কে শুনবে আমার কথা প্রতিকার পাওয়া সম্ভব না, এ হতাশা থেকেই এলো নিস্পৃহতা। আমরা বছরের পর বছর ধরে সমীভূত দূর্গন্ধের সচিভেদ্য দেয়াল টপকে পেরোনোর কথা ভাবতে ভুলে গেলাম।

কিন্তু অত্যাচারীর অন্ত যে আসতেই হতো। এমনটাই হয়। এটাই নিয়ম। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। একে ঠেকানোর উপায় নেই। সময় নিজে দায়িত্ব নিয়ে শোষকের সর্বনাশ বয়ে আনে। কালের এই অমোঘ নিয়ম ফাঁকি দেবে ক্ষমতা কারো নেই। গোয়েবলসীয় মিথ্যা বলে যে প্রবাদটি আছে তার বাস্তব অস্তিত্ব আমরা দেখলাম। হিটলারের দুর্ভাগ্য, প্রোপাগান্ডা নামক দাবানল ছড়ানোর জন্য তার একজন মাত্র মন্ত্রী ছিলেন। আমরা তো শ'খানেক প্রত্যক্ষ করলাম। এমন এমন মিথ্যা, বানোয়াট নাটক আর বেমালুম অস্বীকারের আকাশ-কুসুম গল্প আমরা শুনলাম, ক্রোধে উন্মত্ত হব, নাকি তাদের মূর্খতায় বিদ্রুপের অট্টহাসি হাসব, তাই বুঝে উঠতে পারলাম না। কিন্তু এইসব মিথ্যাচার, এই প্রকাশ্য প্রহসন, চরমপন্থা অবলম্বন আর কুমিরের কান্না বলে দেয় দিন তাদের ঘনিয়ে এসেছে। পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে প্রাজ্ঞ বিজ্ঞজনের এ বাণী তো মিথ্যা নয়।

ইতিহাস থেকে যারা শিক্ষা নেয় না,তাদের তো এমন পরিণতিই হওয়ার ছিল। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ লিখেছিলেন, যে কবিতা শুনতে জানে না, সে ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে। আর্তনাদ কি তারা শুনছে? কালের যাত্রার ধ্বনি কি তারা শুনছে?

"আমি কিংবদন্তির কথা বলছি" কবিতাটি আমার হৃদয়ের খুব কাছের। আজ মনে হচ্ছে, কী চমৎকারভাবেই না কবিতাটি আমাদের আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে গেল, নিজের সভ্যতা প্রমাণ করে গেল। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, আজকের বাংলাদেশের স্বৈরাচারী সরকার আর আন্দোলনকারী সাধারণ বাঙালি একই পূর্বপুরুষের উত্তরসূরী। স্বৈরাচারীরা সেই কিংবদন্তির কথা বেমালুম ভুলে গেছে। কিন্তু আমরা তুলিনি। আজ বুকের ছাতি উঁচু করে গৌরবের সাথে আমরা এ ঘোষণা দিতে পারি, আমরা তার মতো কবিতার কথা বলতে পেরেছি, আমরা নতুন প্রজন্ম তার মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পেরেছি। আমরা এ পংক্তিমালা উচ্চারণ করার অধিকার অর্জন করেছি। "যখন প্রবঞ্চক ভূস্বামীর প্রচন্ড দাবদাহ আমাদের শস্যকে বিপর্যস্ত করলো তখন আমরা শ্রাবণের মেঘের মত যূথবদ্ধ হলাম। তখন বিষসর্প প্রভুগণ অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করলো এবং আমরা ঘন সন্নিবিষ্ট তাম্রলিপির মত রৌদ্রালোকে উদ্ভাসিত হলাম।
না, কবিতা প্রাসঙ্গিক হলো না. আমরাই আজ কবিতা হয়ে গেলাম।

প্রজেক্ট প্যান্থা

মহিমা ইউছুপ জেরিন
৩৩তম বিডিএস
রোল: ৫৮

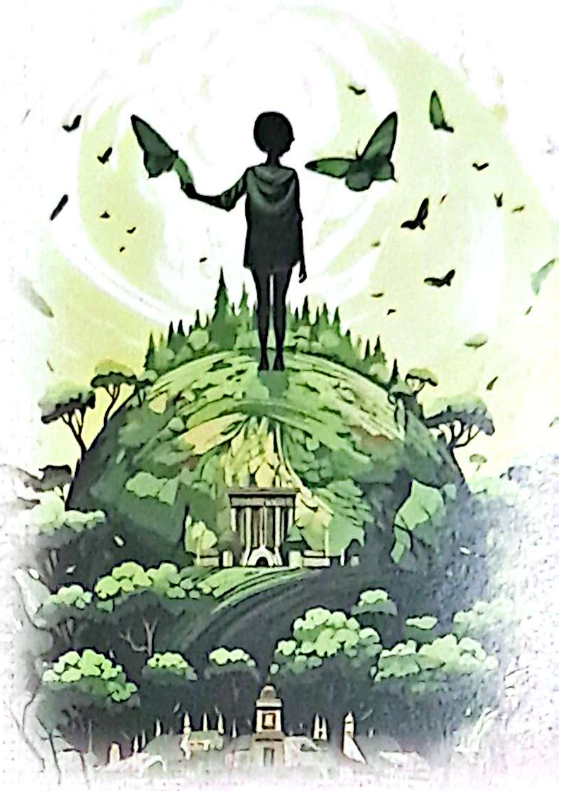

২২৪৭ সাল।
পৃথিবীর দেশগুলো এক ভয়াবহ ইতিহাস পেরিয়ে এসেছে - বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, বিভাজন, বিভ্রান্তি। সবাই বুঝেছে, সমস্যা অস্ত্রে নয়, স্মৃতিতে। সত্য, ইতিহাস, বিশ্বাস - একেক জনের একেক রকম, তাই সংঘাত থামে না।
এই দ্বন্দ্বের সমাধানে গঠিত হয় যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক প্রকল্প: প্রজেক্ট প্যান্থা। একটি নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়- "নিউরো-রিসোন্যান্স তরঙ্গ", যা পৃথিবীর মানুষের মস্তিষ্কে একই ফ্রিকোয়েন্সিতে এক ধরনের "সমষ্টিগত বাস্তবতা" ছড়িয়ে দিতে পারে। ফলে সবাই একই ইতিহাস মনে রাখে, একই সত্য বিশ্বাস করে, কেউই প্রশ্ন করে না। বিশ্ব শান্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আলিনা রাই, একজন মনোবিজ্ঞানী, কাজ করে "স্মৃতি বিকৃতি" (গবসড়ৎু উৎরভঃ) ট্র্যাকিং টিমে। তার কাজ, যারা "ভিন্নভাবে" স্মৃতি মনে রাখছে তাদের শনাক্ত করা। একদিন সে দেখে, এক শিশু-নাম সায়ান-কথা বলছে এমন স্মৃতি নিয়ে, যা কারো মাথায় থাকার কথা নয়। সে বলে, "আমার মা বলেছে আমরা মঙ্গলগ্রহে জন্মেছি। আমি নিজে লাল আকাশ দেখেছি।"

আলিনা হাসে, ভাবে শিশুর কল্পনা। কিন্তু সে আঁচ করে, কিছুর মিল নেই। পরপর কয়েকজন মানুষ, যারা একে অপরকে চেনে না, একই অদ্ভুত স্মৃতি বলছে - আগুনের শহর, দুই সূর্য, মাটির নিচে বাস, একও আলোকমানবীর কথা।
এরা সবাই বলে, "তারা ভুলে যেতে চায়নি, কিন্তু ওরা মুছে দিয়েছে।"

আলিনা তদন্ত চালিয়ে এক ফেলে-আসা জায়গায় পৌঁছে যায় - "জিরো ওয়েভ রুম" নামে এক নিষিদ্ধ এলাকা, যেখানে নিউরো-রিসোন্যান্স তরঙ্গ পৌঁছাতে পারে না।

সেখানে গিয়ে সে নিজের মস্তিষ্ক স্ক্যান করে। তার সামনে ভেসে ওঠে এক বিকল্প জীবন। এক ভাই, যাকে সে দেখেছিল "শান্তির দূত" হিসেবে, সে ছিল এক বিদ্রোহী বিজ্ঞানী, যাকে হত্যা করা হয়েছিল সরকারবিরোধী স্মৃতি ছড়ানোর অভিযোগে।
আলিনা হিমশীতল হয়ে যায়। সে বুঝে যায় - তার নিজের স্মৃতিও ইনপ্লান্টেড। সে আর নিজে নেই। বরং এমন একজন নারী হয়ে উঠেছে, যাকে তৈরি করা হয়েছে ভুয়া ইতিহাস রক্ষার জন্য। তার ভেতরে প্রশ্ন দানা বাঁধে, "এই সমাজ যদি মিথ্যায় শান্ত থাকে, তবে কি সত্য বলাটা অপরাধ?" তবু সে চুপ করে না। সে সিদ্ধান্ত নেয় "জিরো ওয়েভ রুম" এর তরঙ্গ সরাসরি বিশ্বজুড়ে সম্প্রচার করবে, যাতে মানুষ নিজের পুরনো স্মৃতি ফিরে পায়, বুঝতে পারে, তারা আসলে কারা।

সে বাটন টিপে দেয়। তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে কিছুই হয় না। তারপর সারা দুনিয়ায় মানুষের চিৎকার। কেউ বলে, "আমার বোন তো জীবিত ছিল! কেন বলছে সে মৃত?" কেউ বলে, "আমি তো কখনো এই শহরে ছিলাম না!" কেউ কাঁদে, কেউ হাসে পাগলের মতো। অনেকেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। মানুষের মস্তিষ্ক এই বহু বাস্তবতা সহ্য করতে পারে না।

বহুদিন পর এক নির্জন কক্ষে আলিনা একা বসে। বাইরে কেবল অন্ধকার। হঠাৎ একটি বাচ্চা কণ্ঠ ফিসফিস করে বলে, "তোমরা সত্য চেয়েছিলে, পেয়েছো। এখন বলো, এর ভার কে নেবে?" আলিনা আয়নায় নিজের মুখ দেখে। চোখে নিজের প্রতিচ্ছবি নেই। তার মাথায় বাজছে হাজারো স্মৃতির গুঞ্জন - কোনটা নিজের, কোনটা অন্যের, ঋজানে না। সে মনে মনে বলে, "স্মৃতির চেয়ে ভয়ংকর কিছু নেই, যদি সত্য একাধিক হয়।"

CamScanner

সময়ের যাত্রা

হাসান ইব্রাহিম
৬৩ তম এমবিবিএস

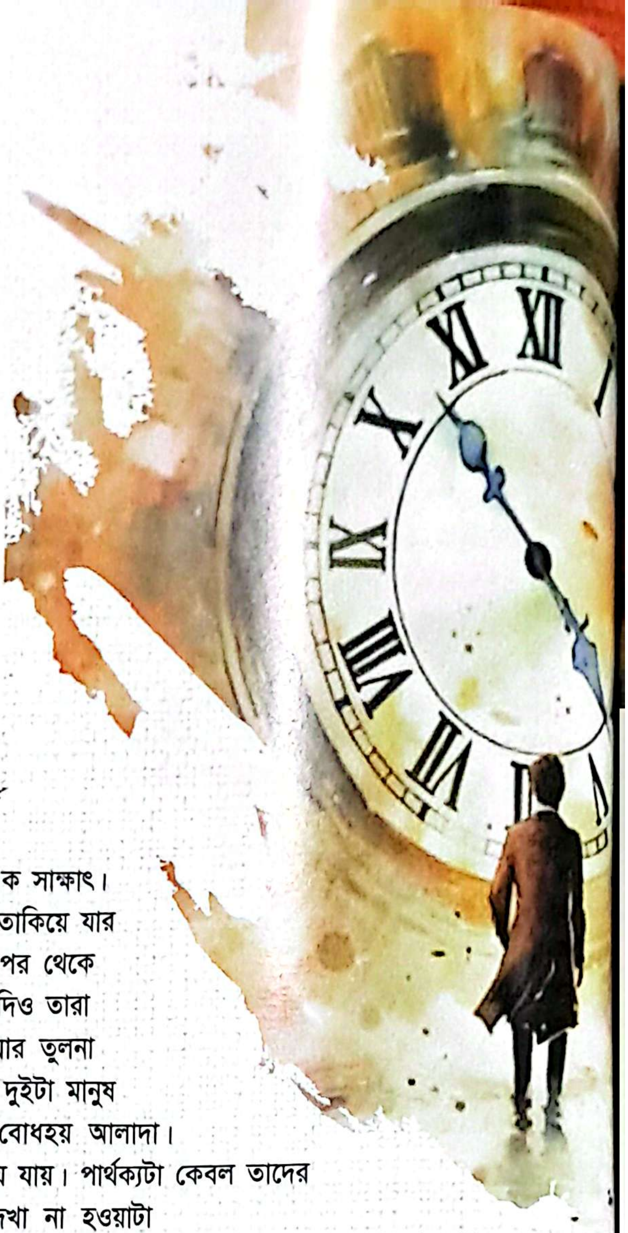

একটু আগে পাতা ধোয়া বৃষ্টি নেমে গেলো। পথের পাশের দোকানগুলো আবার যেন প্রাণ ফিরে পেলো। কারো ইশারা ছাড়াই নেমে পড়লো নিজ কাজে। পথচারীদের ভিড় বাড়লো। মহাবিশ্বের এত এত আলোকবর্ষের অন্তরালে এই প্রথম দুইটা মানুষ মুখোমুখি দাঁড়াল। তবুও যেন অদরকারি এক সাক্ষাৎ। সময়ের ক্ষেপণ মাত্র। দুজন এক পলক অপরের মুখে তাকিয়ে যার যার ডান পথ খুঁজে নিলো। দুইটা নির্লিপ্ত মুখ একে অপর থেকে আবার মিলিয়ে গেলো। খুব সম্ভবত চিরদিনের জন্য। যদিও তারা এক শহরে থাকে। পুরো পৃথিবীর ভূগোলের তুলনায় যার তুলনা বিন্দুতুল্য। একটা বিন্দুর মধ্যেও কি অসীম দুরত্ব নিয়ে দুইটা মানুষ আবার বাস করবে। এদিক থেকে তারাদের দুনিয়া বোধহয় আলাদা। তারাদেরও এরকম পথ চলতে দেখা হয়। আবার হারিয়ে যায়। পার্থক্যটা কেবল তাদের বিচরণের দুনিয়া কল্পনার চেয়েও বড়। সে হিসেবে দেখা না হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না হয়তো।

মানুষের দুনিয়ায় ফিরি আবার। সময়ের হিসাবটা সূর্যের আলো দিয়েই করা যায়। আমাদের এই যাত্রা কি সময়ের শুরু থেকেই নাকি যেদিন থেকে আমাদের এই হাঁটা শুরু সেদিন থেকেই সময়ের হিসাব ধরে এগুতে থাকলাম অনন্তর। খোদা আদম আর হাওয়াকে দুনিয়ায় পাঠাইলেন। বেহেশত থেকে প্রথম এবং সম্ভবত শেষবারের মত মানবকুলের দুনিয়ায় অবতরণ। খোদা তো তাদের ঘড়ি দিয়ে পাঠান নাই। ভাষা আর চিন্তা দিলেন। শুরু হয় মানবজীবনের আরেক ভ্রমণ গল্প। আদমের কোনো এক সন্তান পাহাড় উপত্যকা আর মরুভূমি পেরিয়ে হাজির হয় উর্বর ভূমির প্রান্তে। যেখানে মিলিত হয় টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস। কারো ভাষায় দজলা আর ফোরাত। যেন এই ক্ষণের অপেক্ষায় ছিল সমগ্র দুনিয়া। উচ্ছ্বসিত ঢেউ ছুঁয়ে দিল আদম সন্তানের পা। কৃষির সূচনা হইলো। পৃথিবীতে আসলো মেসোপটেমিয়া সভ্যতা। বলা হয় তারাই প্রথম ষাট ভিত্তিক গণনা শুরু করে। সেখান থেকে সময়ের হিসাবে ষাটের যাত্রা শুরু যা আজও বর্তমান। সময় ধরে মানুষ আগায় না। মানুষের পদতলেই সময়ের রেখা অঙ্কিত হয়ে আসে। ঝড় হয়, জলোচ্ছ্বাস হয়। মানুষের সংগ্রামের গল্প তৈরি হয়। কখনো ক্রোধে বা ভালোবেসে মানুষ লড়াইয়ে নামে। নীল থেকে সিন্ধু বয়ে বেড়ায় সেই ক্ষত।

CamScanner

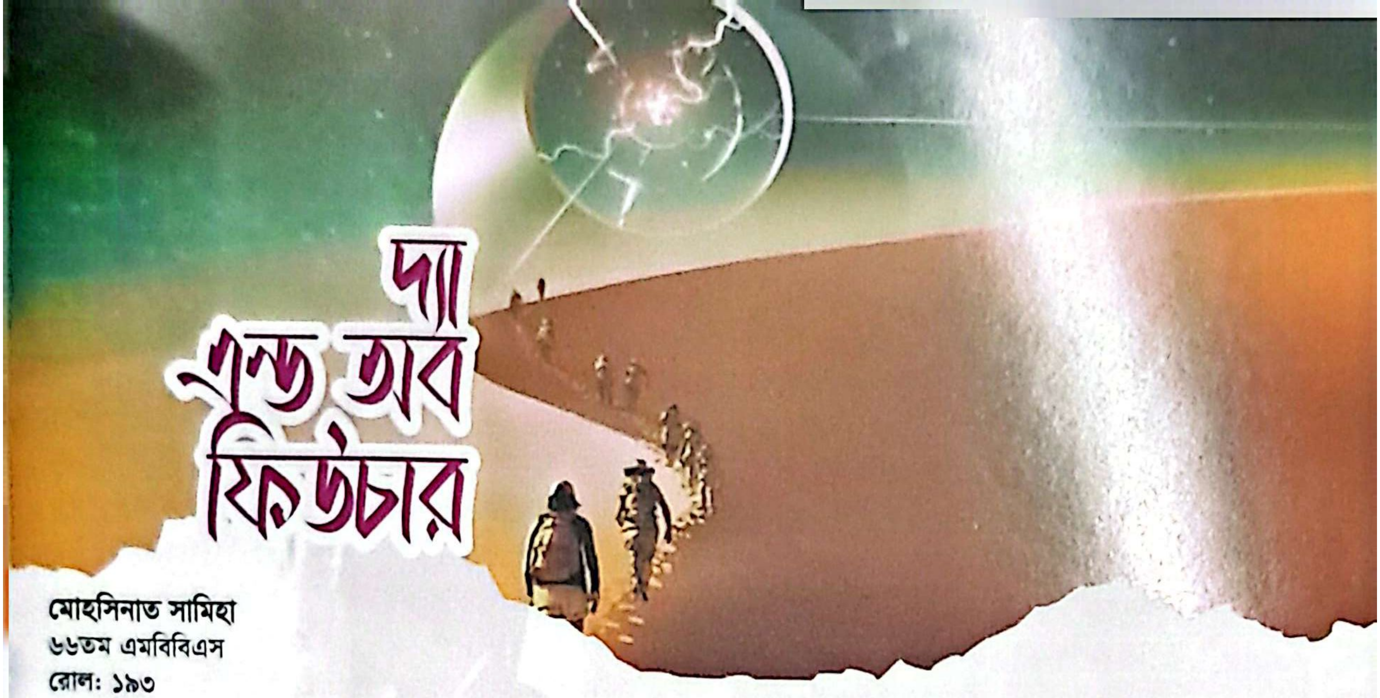

দ্যা এন্ড অব ফিউচার

মোহসিনাত সামিহা
৬৬তম এমবিবিএস
রোল: ১৯৩

সূর্যটা প্রতিদিন একটু একটু করে বড় হচ্ছে।
পূর্বদিকের মেমব্রেনওয়াল দিয়ে আদিগন্তবিস্তৃত আকাশের চমৎকার রংবদল দেখা যায়। দিন আর রাতের বড় একটা সময় আমার এই দেয়ালের সামনে বসেই কাটে।এখন আর করারই বা কী আছে? অখণ্ড অনুত্তেজক অবসর তাই এভাবেই কাজে লাগানো।
আজ ১২ বছর হলো আমি নিশ্চল হয়েছি। সেই থেকে এই বাড়িতেই আছি। একা। আজও স্পষ্ট চোখে ভাসে ১২ বছর আগের সেদিনটার কথা, যেদিন ইমমোবিলিটি এজেন্সির লোকগুলো আমাকে এখানে রেখে যেতে এসেছিল।

"মিসেস লামিজ, আপনার দীর্ঘ ৪৩ বছরের একনিষ্ঠ সেবাদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আপনার ইমমোবিলিটি পিরিয়ডের রিহ্যাবহোম হিসেবে এই বাড়িটি আপনাকে দেয়া হলো। আপনার বার্ধক্যের জন্য সমবেদনা। বিদায়।"
ব্যস, দরজা বন্ধ হয়ে গেল। চিরদিনের মতো। বাকি পৃথিবীর সাথে আমার ৬৫ বছরের সম্বন্ধ দরজার বাইরে রয়ে গেল।২৩ জুন ৩০৪৫, সরকারি খাতায় এবং এই পৃথিবীর নিয়ম অনুযায়ী আমার 'সার্ভিস এরা' শেষ হলো, আর তার সাথে সাথে আমার অস্তিত্বের প্রয়োজনও ফুরোলো। আমার চ্যাপ্টারের মলাট বন্ধ হলো।

এরপর থেকে আমার এই নিশ্চল জীবন শুরু। ইমমোবাইল। এখনকার সরকারি স্কিম অনুযায়ী এটাই আমার পরিচয়। আমি বৃদ্ধ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় আমি বেঁচে আছি। আমাকে এ পৃথিবীর আর কোনো কাজেই লাগাবার নেই। নগ্ন ভাষায় বলতে গেলে, আমি এক্সপায়ার হয়ে যাওয়া নিউট্রি সিমুলেটরের মতো। যতদিন পুষ্টি নেওয়া যায় ততদিনই আমার কদর। এরপর ইলেকট্রনিক্স ডিসপোজারে আমার জায়গা। তো আমার মতো এমন এক্সপায়ার্ড মানুষদের জন্য সরকারের এই স্কিম।

সার্ভিস এরা শেষ হবার পর আমাদের সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। অন্তর্হিত। প্রকাশ্য পৃথিবীর কাছে আমরা অস্তিত্বহীন। সোজা কথায়, আমাদের লুকিয়ে ফেলা হয়।
ইমমোবিলিটি পিরিয়ডের আরেকটা নাম আছে। টার্মিনাল এরা। মৃত্যুতেই এই পিরিয়ডের সমাপ্তি। তাই এমন নাম।এই সময়ে আমাদের গৃহবন্দি করে রাখা হয়। আমরা বাইরে বেরোতে পারি না। আমাদের সাথে কেউ থাকতে পারে না।আমাদের সকল পাস্ট সোশ্যাল প্রেজেন্স মুছে ফেলা হয়। শারীরিকভাবে মৃত না হলেও আমরা সামাজিকভাবে মৃত ঘোষিত হই।

এই অমানবিক আইসোলেশন প্রোগ্রামের কম্পেনসেশন প্রাইজ হিসেবে আমাদের দেওয়া হয় একটি ৬০০ স্কয়ার ফিটের রিহ্যাবহোম। হালের অল ইন ওয়ান আল্ট্রামডার্ন বাড়িগুলোর মতোই এই হোম। তবে ছোট, খুব ছোট। তাই এগুলোকে ন্যানোরেসিডেন্সও বলে। অবশ্য বুড়ো একজন সাড়ে ৫ ফিটের ৬৪ কেজি ভরের মানুষের এরচেয়ে বড় বাড়ি দিয়ে আর কী কাজ?

এখানে সব আছে, সব। ন্যানোলাইফকে ধন্যবাদ, একজন মানুষের বেঁচে থাকার সব উপকরণকে একটা ৬ ইঞ্চি বাই ৪ ইঞ্চি কম্প্যাক্ট বক্সে জায়গা করে দেওয়ার জন্য। বক্সটা একটা অল ফাংশনাল লাইফস্টাইল টুলকিট। পুষ্টি আর শক্তির জন্য নিউট্রি সিমুলেটর, অসুস্থতায় অটোমেটেড প্যাথোলজি ডিটেক্টর আর এআই মেডিকেশন জেনারেটর, বিনোদনের জন্য ভার্চুয়াল সেনসিটিভিটি স্টিমুলেটর-কি নেই। কেবল নেই কমিউনিকেশন লিবার্টি। পৃথিবীর কারো সাথে সরাসরি যোগাযোগে কোনো স্বাধীনতা নেই আমাদের। নির্দিষ্ট কিছু কন্ট্রোল সেন্টারের এআই জেনারেটেড স্মার্ট ভয়েস ছাড়া আর সকলের দরজা আমাদের জন্য বন্ধ।

সরকারকে এই নিয়ম চালু করতে সবার প্রথমে প্রস্তাব দেয় এই বত্রিশ শতকের সবচেয়ে বড় মানবাধিকার রক্ষা কমিশন "সেন্ট্রাল এজেন্সি ফর রিজার্ভেশন অব ইউনিভার্সাল লাইভস"। তাদের করা প্রতিবেদনটি যখন সামনে আসে তখন সারা পৃথিবীজুড়ে হইচই পড়ে যায়।
সিনিয়রদের হটিয়ে প্রমোশন পাওয়ার লোভে যতদ্রুত সম্ভব এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবি তোলে। এমন একটা ভাব তাদের, যেন তারা কোনোদিন বৃদ্ধ হবে না।

কিন্তু সবচেয়ে অবাক করার ব্যাপার হলো, বৃদ্ধদের মধ্য থেকেই অনেকে এর পক্ষে অবস্থান নিল। অবশ্য সন্দেহ নেই, সুযোগ সুবিধা লোভনীয়। এই যে বৃদ্ধরা একটা অল ইন ওয়ান বাড়ির লোভে নিজেদের রীতিমতো মৃত ঘোষণা করতে রাজি,এদের বেশিরভাগই বড়-হয়ে-যাওয়া সন্তানের অবজ্ঞার অনুগ্রহ বেঁচে আছেন। কিংবা ইতোমধ্যেই সন্তানেরা তাদের ত্যাগ করেছে। পৃথিবীর ৮৬ শতাংশ বৃদ্ধের পরিণতিই এমন।

একারণেই এ পদ্ধতি তাদের জন্য মন্দের ভালো। শর্ত কেবল একটাই, ৬৫তম জন্মদিনের দিনটিই এ পৃথিবীর বুকে আপনার জন্য শেষ দিন।

খুব দ্রুত সরকার এ পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দিল। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থেকে ৩০০০০ কিমি দূরে, পৃথিবীর আর এইচ৭৭ গ্রহের সংযোগরেখার মধ্যবিন্দুতে এই ফ্লোটিং কলোনি বানানো শুরু হয়।৪৫ দিনের মাথায় কাজ শেষ করে শুরু হয় বৃদ্ধদের রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম। এই জায়গা নির্দিষ্ট করে বেছে নেওয়ার কারণ প্রকাশিত হয়নি। তবে অনেকেই বলত, এই বিশেষ এরিয়াতে সূর্যসহ আরও তিনটি নক্ষত্রের সরাসরি নিউক্লিয়ার ফোকাস পয়েন্ট রয়েছে। এই জায়গায় কসমিক রশ্মির প্রভাব এতটাই বেশি যে, আমাদের এই সম্পূর্ণভাবে ইনসুলেটেড ন্যানোহোমগুলোর অত্যাধুনিক মেমব্রেনওয়ালও তা প্রতিহত করতে পারেনা। সরকারের লোকেরা জেনেশুনেই এই স্পট বেছে নিয়েছে, যেন রেডিওএক্টিভিটির এক্সপোজার আমাদের বার্ধক্যকে আরও ত্বরান্বিত করে দ্রুত আমাদের মৃত্যু ঘটাতে পারে।

এই হলো মানবাধিকার। যন্ত্রণা দিয়ে মারা অবশ্যই মানবাধিকার লঙ্ঘন। তাই এমন পথ বেছে নেওয়া, যাতে মানুষ নিজে হেঁটেচলে মৃত্যুর কাছে যায় এবং লুটিয়ে পড়ে এবং মানবাধিকারের মুকুটের সব পালক অক্ষত থাকে।

সর্বশেষ আদমশুমারি এক ভয়াবহ পরিস্থিতির পূর্বাভাস দিয়েছে। আমাদের এ পৃথিবীতে আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধের সংখ্যা বাড়ছে। একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী আগামী আদমশুমারি আসতে আসতে বার্ধক্য লাভ করবেন। বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর এই সংখ্যাধিক্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। এর ফলে পৃথিবীর কর্মক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। নতুন ধ্যান ধারণা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে না।বৃদ্ধদের এই আধিপত্য তরুণদের নিরুৎসাহিত করছে। নিজেদের আশপাশে এত অধিকসংখ্যক বৃদ্ধ দেখে তাদের জীবন সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে। তাই অনতিবিলম্বে বৃদ্ধদের লোকচক্ষুর অন্তরালে নিয়ে পুনর্বাসিত করা প্রয়োজন।"

ছোটবেলায় আর্কিওলজিকাল এক্সপেরিমেন্ট ক্লাসে একটা খুব মজার এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম। রিক্রিয়েটিং এনশিয়েন্ট লাইফস্টাইল। ফুড সেকশনের দায়িত্বে থাকা আমি -পপকর্ন" রিক্রিয়েট করেছিলাম। কর্নশেলগুলো একটা একটা করে ফুটে উঠে এক সময় পট উপচে পড়া শুরু করল। বড় হওয়ার পর যখন ডেমোগ্রাফি নিয়ে জানলাম,কেন যেন আমার মাথায় সেই পপকর্ন উপচে পড়ার দৃশ্য ভেসে এল। সাথে একটা

প্রশ্ন। পৃথিবীর মানুষও যদি কোনোদিন এভাবে পৃথিবী উপচে পড়া শুরু করে, তখন কি হবে?

জনসংখ্যা ধারণাতীত হয়ে গেলে অতিরিক্ত মানুষগুলোর কি করা হবে তা নিয়ে সন্দেহ গুজব জল্পনা কল্পনা বহুদিনের। কিন্তু সত্যি সত্যি কি করা হবে তা নাকি ছিল গ্লোবাল গভর্নমেন্টের টপ সিক্রেট বোর্ডের মোস্ট কনফিডেনশিয়াল টপিক অব ডিসকাশন।

সেই প্রশ্নের সূত্র ধরেই সূক্ষ্ম একটা সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইলেও এই অদ্ভুত গবেষণা আর মতামতের বাস্তবায়ন অসম্ভব ভেবেই আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তরুণ আর মধ্যবয়স্কদের মধ্যে খুব দ্রুত সাড়া পড়ে গেল। হঠাৎই সব নিউজ ইন্টারনেট আর সোশ্যাল প্লাটফর্মগুলোর টপ প্রায়োরিটি লিস্টে চলে এল এই সংক্রান্ত সকল কন্টেন্ট। কিছুদিন সবখানে কেবল এই নিয়েই আলোচনা। ভালো দিক খারাপ দিক-যথারীতি দুটো দল হয়ে গেল। ভালো দিকগুলোর কথা যারা বলছিল, দেখা গেল তাদের বেশিরভাগের ঘরেই বৃদ্ধ মা-বাবা আছেন। বলা বাহুল্য, এ পরিকল্পনা সফল হলে তাদের দায়মুক্তি ঘটে।

CamScanner

বড় একটা মধ্যবয়সীদের দল নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বলা বাহুল্য, আমার মতো যে কয়জন আসল ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিল তাদের আওয়াজ চাপা দিতে সরকারকে খুব বেশি টক্সিক শট ব্যবহার করতে হলো না। মাত্র শখানেক বিদ্রোহীকে স্পেশাল চেম্বার ফর ডিসকাশনে আমন্ত্রণ জানানোর পর নাটকীয়ভাবে বেশিরভাগেরই মতের পরিবর্তন হয়ে গেল।

লজিক্যাল বায়োলজিকাল কোনো উপায়েই যখন জনসংখ্যা আর নিয়ন্ত্রণ করা গেল না,তখন পৃথিবীর নীতিনির্ধারকেরা সেই ১৯ শতকের সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট নীতিরই শরণাপন্ন হলো। কেবল সরাসরি মেরে ফেলার মতো কাজটাকে পার্থিব কোনো উপায়ে জাস্টিফাই করা সম্ভব না বলে এই "আওট অব দ্য ওয়ার্ল্ড বাইপাস ওয়ে বের করা।

যা বলছিলাম, আমরা এখানে আছি। মানবসংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, এমনকি আমরা বুড়োরা একে অপরের সাথেও যোগাযোগ করতে পারিনা। আমার পাশের বাড়ি তিনটিতে কারা আছেন, আদৌ এখন পর্যন্ত বেঁচে আছেন কিনা তাও আমি জানিনা। কোনোদিন জানবও না। সরকার কাঁচা কাজ করেনি। আমরা যদি একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে আবার পৃথিবীতে ফিরতে বিদ্রোহ করে বসি, তাই এ ব্যবস্থা।

পূবের ওয়াল দিয়ে আমি প্রতিদিন যা দেখি তা আসলে স্টিমুলেটর জেনারেটেড অপটিকাল ভিউ। তবে সূর্যটা আসল।ওটাকে ঢেকে দেয়া সম্ভব হয়নি।

প্রতিদিন আমি ওই সূর্যটাকে দেখি। মহাকাশে থাকার কারণেই কিনা কে জানে, তবে আমার ৭৮ বছর বয়সী চোখ এর খুব সূক্ষ্ম পরিবর্তনও ধরতে পারে।

গত এক বছর থেকে সূর্যটা তার রং বদলাচ্ছে। হলদে সাদা থেকে সাদা, এখন কেমন যেন নীলচে আভা বেরোচ্ছে। গত কদিন ধরে খেয়াল করছি, তার আকারটাও বদলাচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলাম চোখের ভুল। কিন্তু গত পরশু থেকে সূর্যটা সত্যিই বড় হচ্ছে। যেন ছড়িয়ে দিচ্ছে নিজের পরিধিকে এগিয়ে আসছে একটু একটু করে।
কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আজ আমার পূবের ওয়াল দিয়ে আর সূর্যোদয় দেখা গেল না। হাতের ওয়াচের হিসাব অনুযায়ী আরো ৪৫ মিনিট আগে সূর্যোদয় হওয়ার কথা।

আমি যা ভাবছি তাই কি? গণিতবিদদের হিসাব অনুযায়ী যদিও এইদিন আরও ১৫০০০ বছর পর আসার কথা।

আমার ভয় পাওয়া উচিত কি? মাথায় যদিও অদ্ভুত সব প্রশ্ন আসছে। আমি ছাড়া এই মহাবিশ্বে আর কেউ এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাবার জন্য বেঁচে আছে কিনা কে জানে। যদি থেকেও থাকে, তারা কি এই ঘটনার কোনো পূর্বাভাস পেয়েছে? পাওয়ার কথা। মজার ব্যাপার হলো, সাতপাঁচ করে সব সমস্যাকে বাইপাস করে গেলেও মানুষ এই পরিণতিকে কখনোই বাইপাস করার কথা ভাবতে পারেনি।

মানতেই হবে,এটা একটা ওয়ান্স ইন আ লাইফটাইম এক্সপেরিয়েন্স। কিংবা হয়তো বলা উচিত, ওয়ান্স ইন আ ডেথটাইম।

আমি ইনানা লামিজ,এ বিশ্বজগতের শেষ দিনটি যাপন করছি। এই কসমিক রশ্মির অবারিত তেজস্ক্রিয়তায় বাস করেও অদ্ভুতভাবে বেঁচে আছি হয়ত এদিনটি দেখার জন্যই। একটু পরেই সূর্যাস্ত হবে। পূবের ওয়াল দিয়ে ১২ বছর পর আজ আমি সূর্যাস্ত দেখব।

গন্তব্য

আজিজুল ইসলাম ইমন
৬৬তম এমবিবিএস
রোল: ৬৭

(১)

-স্যার, আম্মু বলেছে আগামীকাল থেকে আপনাকে আর পড়াতে আসতে হবে না।

-ওমা! কেন?

-আসলে আমার আব্বুকে ঢাকাতে ট্রান্সফার করে দিয়েছে। আমরা পুরো ফ্যামিলি ঢাকাতে শিফট হয়ে যাচ্ছি।

টেবিলের দিকে মাথা নিচু করে পরপর দুটো মিথ্যা কথা বলে ফেলল নিরু। মিথ্যা বলার অভ্যাসটা তার কখনোই ছিলো না। তাই লজ্জায় এখন মাথা উঁচু করে তাকাতে পারছে না।

তবে চেহারার দিকে না তাকালেও ঠিকই নিরুর মিথ্যা বলাটা বুঝে ফেলেছে আরিফ। কিন্তু নিরুকে কোনোমতেই সেটা বুঝতে দিচ্ছে না। মিথ্যা বলাতে ভীষণ রেগে গেলেও এই মুহূর্তে নিরুকে কিছু বলাও যাচ্ছে না। কে জানে, হয়তো মায়ের কথাতে বাধ্য হয়েই তাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে।

মেয়েটাকেও বা দোষ দিয়ে কী লাভ! একই ক্লাসে পরপর দুবার ফেল করার পর কোনো অভিভাবকই তার মেয়েকে আগের টিউটর দিয়ে পড়াতে চাইবেন না। আরিফের বেলাতেও এমনটাই হচ্ছে। হয়তো আরিফকে ছাটাই করার জন্য এর চাইতে ভালো কোনো উপায় ছিলো না।

-ও আচ্ছা, তাহলে কবে ঢাকায় শিফট করবে?, শান্ত গলায় আরিফ জানতে চাইলো।

-এখনো জানি না স্যার, তবে শীঘ্রই শিফট করে ফেলবো।

-ঢাকাতে গেলে তো নতুন স্কুলে ভর্তি হতে হবে। তখন কি আগের ক্লাসেই পড়বা?

-জ্বি না, বাবা বলেছে নতুন স্কুলে ভর্তি হলে এক ক্লাস প্রমোশন করিয়ে নিবে।

নাহ! শুরুতে আরিফ মেয়েটাকে মিথ্যা বলাতে যতটা কাঁচা ভেবেছিলো এখন কিন্তু তেমনটা মনে হচ্ছে না। আসলে মিথ্যা কথাটাই এমন! এক-দুটো মিথ্যা বলেই মানুষ মিথ্যা কথাটাকে সহজে আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারে। এরপর সেই মিথ্যার ভেলায় চড়ে সাহস করে সত্যের এক দুর্গম নদী পাড়ি দেবার....

যাই হোক, মেয়েটার এই ভুল ধারণাকে শুধরে দেবার কোনো ইচ্ছেই আরিফের নেই। তবে একমাত্র টিউশনটা চলে যাওয়ায় কিছুটা কষ্ট হচ্ছে বৈ কি। বুকে জমে থাকা একরাশ দুঃখ আর এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে আরিফ বেরিয়ে এলো নিরুর বাসা থেকে। পা বাড়ালো এক অজানা গন্তব্যহীন পথের দিকে।

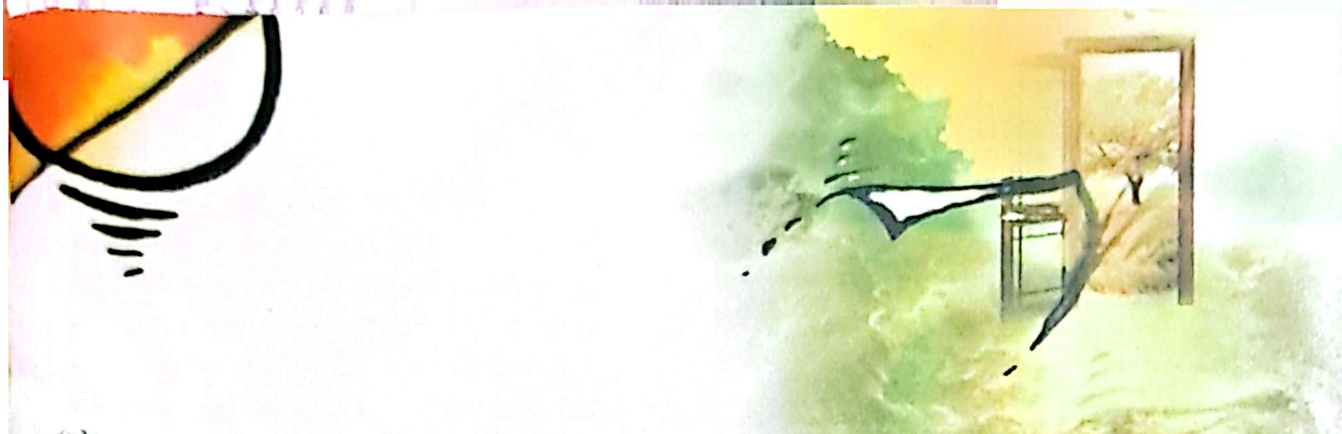

(২)

মাঝে মাঝে মানুষের জীবনে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত এমন কিছু আনন্দময় মুহূর্তের জন্ম নেয় যা হয়তো সে কখনোই কল্পনা করতে পারে না। সে মুহূর্তে মানুষ তার চোখ দিয়ে যা-ই দেখুক না কেন, তাতেই মুগ্ধ হয়ে যায়। রাস্তার ধারে বিশ্রীভাবে শব্দ করা কাকটাকে দেখলেও মনে হয়, "আহা, কী অপরূপ সুর! কতদিন এমন সুর শুনিনি.."

আরিফের বাবা খালেদ সাহেবের মনেও ঠিক এই মুহূর্তে এমন এক অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় একঘণ্টা যাবৎ ঠাণ্ডা হতে থাকা তিক্ত রঙ চা তে চুমুক দিতে দিতে তিনি তার নিশ্চিন্ত জীবনের কথা ভাবছেন। একটা ভালো জায়গা থেকে তার ছোটো মেয়ে চিত্রার জন্য বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। ছেলে উচ্চবিত্ত পরিবারের হওয়ায় এমন সুযোগ্য পাত্র হাতছাড়া করার কোনো ইচ্ছেই খালেদ সাহেবের নেই। আজ পাত্রপক্ষ থেকে লোক আসবে তার মেয়েকে দেখতে। যদি চিত্রাকে তাদের পছন্দ হয় তবে আজই আঙটি পরিয়ে দিবে। আগামী সপ্তাহেই বিয়ে। ভেবেই মন উৎফুল্ল হয়ে উঠছে খালেদ সাহেবের।

-একি আব্বা! আপনি এখনো চা খাওয়া শেষ করেননি? চা তো ঠান্ডা হয়ে গেছে। আমি কি গরম করে নিয়ে আসবো?

-নারে মা, চা গরম করতে হবে না। তুই এখানে বস্। তোর সাথে কিছু কথা বলি।

বাধ্য মেয়ের মতো সামনে পেতে রাখা চেয়ারটাতে বসে পড়লো চিত্রা। মেয়েটা দেখতে অবিকল তার মায়ের মতো হয়েছে। উজ্জ্বল শ্যামলা বরণের, মাথা ভর্তি লম্বা চুল। বাম গালের তিলটা তাকে অসম্ভব রূপবতী করে তুলেছে। প্রথমবার যখন খালেদ সাহেব চিত্রার মাকে দেখেছিলেন তখন অবাক হয়ে ভেবেছিলেন, "আশ্চর্য! একটা মেয়ে কীভাবে এতটা মায়াবতী হয়!" আজ যেন নিজের মেয়েকে দেখেও তার অতীতের সেই কথাটা মনে পড়ছে। মুহূর্তেই মেয়ের জন্য হাহাকার করে উঠলো মনটা।

-'আব্বা মনে হয় কিছু বলতে চেয়েছিলেন', খালেদ সাহেবকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনলো চিত্রা।

মুহূর্তে সম্বিৎ ফিরে পেলেন খালেদ সাহেব। তার চোখের কোণে পানি জমেছে। মেয়েকে কোনোমতেই চোখের পানি দেখতে দিতে চাচ্ছেন না।

-"কি বলতে চেয়েছিলাম মনে পড়ছে না", হেসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলেন খালেদ সাহেব, "আচ্ছা মা, তুই এখন বিশ্রাম নে, রাতে তো তোকে পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে।"

-'ঠিক আছে আব্বা', চেয়ার থেকে উঠে নিজের রুমের দিকে পা বাড়ালো চিত্রা।

রুমে ঢুকেই তড়িঘড়ি করে ফোনটা হাতে নিলো সে। কল লিস্টে সেভ করে রাখা প্রথম নাম্বারটাতে কল দিলো। ফোনটা বেজেই চলেছে।

একবার.... দুইবার....তিনবার....

কিন্তু অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তিটির মধ্যে কল রিসিভ করার কোনোরকম আগ্রহ বা ইচ্ছা দেখা গেলো না।

(৩)

সকালের লেকচার শেষ করে আরিফ দেখতে পায় তার ফোনে দশটা মিসড কল। তার বাবা ফোন করেছে। ভীষণ অবাক হলো আরিফ। যে মানুষটার সাথে পুরো মাসেও একবার কথা হয়না সেই মানুষটাই কিনা দশবার কল দিয়ে ফেলেছে।

-আসসালামুআলাইকুম আব্বা।

-'ওয়ালকইকুমুস সালাম, কেমন আছিস?', উৎফুল্ল কণ্ঠে জানতে চাইলেন খালেদ সাহেব

-এই তো আব্বা ভালো, আপনাদের কী খবর?

-আমরাও ভালো আছি। শোন, একটা খুশির খবর আছে। তোর বোন চিত্রার তো বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি। গতকাল পাত্রপক্ষ দেখতে আসছিলো। চিত্রাকে দেখে এতোই পছন্দ হয়েছে যে গতকালই কথা পাকাপাকি করে ফেলেছে। এই শুক্রবারেই তারা আকদ করে ফেলতে চাচ্ছে।

-বলেন কি আব্বা, আপনারা কেউই তো কিছু জানালেন না!

-আসলে সবকিছুই এত দ্রুত হয়ে গেছে যে জানানোর সময়টুকুও ছিলো না। আচ্ছা শোন, আজ তো বুধবার, তুই আগামীকাল ক্লাস শেষ করে গ্রামে চলে আয়। এখানে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

-কিন্তু আব্বা চিত্রা তো....

-কোনো কিন্তু না, তুই কালই গ্রামে চলে আসবি এটাই শেষ কথা। আমি এখন রাখছি, আল্লাহ হাফেজ।

ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে আরিফের। চিত্রার এই মুহূর্তে বিয়ে দেয়া কোনোভাবেই সম্ভব না। যে করেই হোক তার বাবাকে সেটা বোঝাতে হবে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, আজ রাতেই বাড়ি ফিরছে সে। তার মন বলছে আজ বাড়ি না গেলে বড়সড় কোনো অঘটন ঘটে যাবে।

(৪)
সকাল হতেই মহা ব্যস্ত খালেদ সাহেব। মেয়ের বিয়ের পুরো দায়িত্ব তাকে একাই সামলাতে হচ্ছে। বিয়ের কাজটা যদিও মোটামুটি গুছিয়ে ফেলেছেন তবে একটা বিষয়ে খটকা কোনোমতেই দূর হচ্ছে না।
পাত্রপক্ষ আঙটি পরিয়ে যাবার পর থেকেই মেয়ের মধ্যে কিছু অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করছেন তিনি। কেন জানি মনে হচ্ছে বিয়েতে মেয়েটার মত নেই। মেয়ের সাথে এই বিষয়ে দু-একবার কথা বললেও তেমন কোনো লাভ হয় নি। তার মনে হচ্ছে মেয়েটা হয়তো তার কাছে কোনো কিছু গোপন করছে। বহুবার চেষ্টা করছেন এইসব আজেবাজে চিন্তা মনের মধ্যে প্রশ্রয় না দিতে। কিন্তু কিছুতেই এই গোলকধাঁধা থেকে বের হতে পারছেন না।
"মেয়েটাকে আরো চোখে চোখে রাখতে হবে", মনে মনে স্বগোতক্তি করছেন খালেদ সাহেব, "আচ্ছা কোথাও এমনটা নই তো যে মেয়েটা সত্যিই....."
হঠাৎই চিত্রার রুম থেকে আসা বিকট শব্দে আঁতকে উঠেন খালেদ সাহেব।

রাত দশটা বেজে তিরিশ মিনিট। হোস্টেলের সামনে রিকশার জন্য অপেক্ষা করছে আরিফ। হঠাৎ কী মনে করে যেন হাঁটা শুরু করলো। দেখে মনে হচ্ছে আজ কোনো তাড়া নেই আরিফের। যেন পৃথিবীর সবগুলো ঘড়ি থেমে আছে তার ফেরার প্রতীক্ষায়। সময়ের গন্তব্যগুলো আজ একই মাত্রাতে এসে এক হয়ে গেছে।
তবে আমাদের দৃশ্যপটে বিদ্যমান আরিফের গতি কিন্তু থেমে নেই। বর্তমানে তার গন্তব্য চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালের মর্গের দিকে। একটু আগে বাড়ি থেকে ফোন এসেছিলো। তার বোন চিত্রা সুইসাইড করেছে।
এই মুহূর্তে তার ডেড বডিটা আছে মেডিকেলের মর্গে।

খবরটা পেয়ে কেন জানি আরিফ তেমন একটা উৎকণ্ঠিত হলো না। যেন এমনটা হবারই ছিলো। চিত্রার সুইসাইডের পরে বাড়ির অবস্থা কেমন হতে পারে মনে মনে এটাই ভাবছে সে। তার মা হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। বাবা হয়তো বাড়ির সামনে উঠানটাতে বসে বিলাপ করছেন, "হায় রে মা! কেন এমনটা করতে গেলি তুই? এই বিয়েতে তোর মত নেই সেই কথাটা কি একবারও বলতে পারতি না??"
সত্যিই কি চিত্রা জানাতে পারতো না এই বিয়েতে তার অমতের কথা? হয়তো পারতো, কিন্তু তাতে কিই বা আসে যায়? সমাজ কি পারতো তার গর্ভে আসা দুই মাসের বাচ্চাটাকে মেনে নিতে? বিয়ের আগেই অন্তঃসত্ত্বা হবার এই কলঙ্ক নিয়ে সে কীভাবেই বা সমাজে বেঁচে থাকতো? নিজের আর পরিবারের সম্মান রক্ষার জন্য এর চাইতে ভালো কোনো উপায়ই তার কাছে হয়তো ছিলো না।

হঠাৎ করে বোনের কথা মনে হতেই চো[illegible] ভিজে এলো আরিফের। কত আদরেরই না ছিলো তার [illegible]নটা। প্রতিবার বাড়ি আসার আগে বায়না করতো এটা-ওটা আনার জন্য। গতবার বায়না করেছিলো দুই গোছা কাঁচে[illegible] চুড়ির জন্য। চুড়িগুলো এখনো তার কাঁধের ব্যাগেই আ[illegible]। কার জন্য নিয়ে যাচ্ছে সেটা আরিফ জানে না। তার এখনো বিশ্বাস বাজে এক দুঃস্বপ্ন দেখছে সে। এখনই ঘুমটা কেটে যাবে। চোখের পলক মেলতেই দেখবে তার বোন চিত্রা উঠানের মাঝখানে থাকা দোলনাটাতে দোল খাচ্ছে। তাকে দেখে দৌড়ে আসবে। উদগ্রীব হয়ে বলবে, "ভাইয়া, ভাইয়া! আমার জন্য কী আনসো?"

মর্গের কাছাকাছি চলে এসেছে আরিফ। পকেট থেকে ড্যাম খাওয়া শেষ সিগারেটটা মুখে নিয়ে জ্বালিয়ে নিলো। ঘুটঘুটে অন্ধকারে সিগারেটের শেষ প্রান্তে জ্বলতে থাকা লাল আলোটা তাকে অদ্ভুত এক মানসিক শান্তি দিচ্ছে। নিজের প্রশান্তিটাকে আরেকটু বিস্তৃত করতে গুনগুনিয়ে গান গাওয়া শুরু করলো আরিফ, "আমাকে আমার মতো থাকতে দাও,
আমি নিজেকে নিজের মতো গুছিয়ে নিয়েছি, যেটা ছিলো না ছিলো না, সেটা না পাওয়াই থাক, সব পেলে নষ্ট জীবন।"
আরিফের মনে হলো সব পেলে জীবন কখনোই নষ্ট হয় না। কিন্তু সব পাওয়ার লোভে এই পৃথিবীর মানুষেরা মত্ত হয় এক অসম এবং বিধ্বংসী প্রতিযোগিতায়। স্বার্থের প্রয়োজনে মুহূর্তেই চুরমার করে ফেলতে চায় সবকিছু।

অভিমান

ডা. মোহাম্মদ সালাহউদ্দীন সাহেদ চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক, হেপাটোলজি বিভাগ
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

সুরঞ্জনা: বরং ওইখানে যাও
বলো কথা ঐ যুবকের সাথে,
বলবো না ফিরে আসো:
নক্ষত্রের রূপালি আগুন যতই পোড়াক...

বলবো না আমাদের প্রেম, এই খানে ঘাস হয়ে আসে
বলবো না কোন ভাবে...
আমি তো জানোই দুঃখী হয়ে আছি, মেঘের স্বভাবে

জলেরা বরফ হয়: বরফেরা জল
তবুও বরফ কিছু গলেনা কখনো...

ষড়ঋতু

ডা. এ.কিউ.এম. মহিউদ্দিন মাসুম
প্রভাষক, ডেন্টাল ইউনিট
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

এ বসন্তে তোমায় আমি বাসবোনা ভালো,
এবার বর্ষা এলে প্রেমটা আমার হবে জমকালো।
আমার প্রেমটা ভীষণ গভীর, একটা শান্ত দীঘি,
এক বসন্তে হয়না প্রকট, চলবে নিরবধি।

আমার প্রেমে লুকিয়ে আছে আকাশ ভরা তারা,
এমন আকাশ কোথায় পাবো কেবল শরৎ ছাড়া।
প্রেম মানেতো শ্রাবণধারা, অঝোর বরিষণ,
এক মুহূর্ত হাজার লাগে, হাজার কিছুক্ষণ।

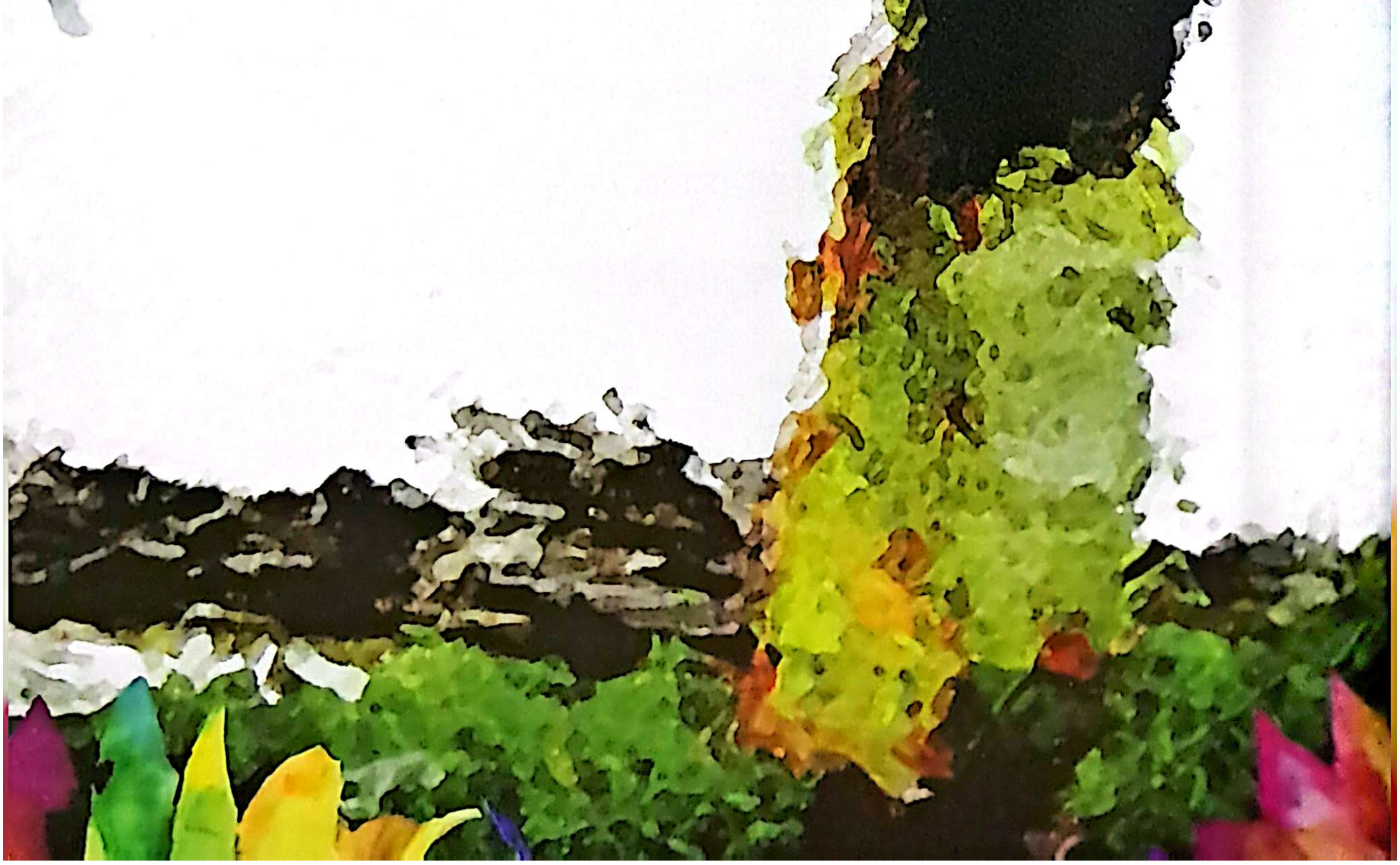

স্বপ্ন

ডা. মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন
সহযোগী অধ্যাপক, ডেন্টাল ইউনিট

স্বপ্নদেরও গতিপথ আছে
কখনো সরল-কখনো বক্র; কখনো বন্ধুর-কখনো মসৃণ

স্বপ্নরাও বাক নেয়; কখনো বামে-কখনো ডানে,
কখনো মাঝপথে স্থির দাঁড়িয়ে।
তারপর উর্ধে বা নিম্নে, হয়তবা বাতাসে মিলিয়ে

স্বপ্নরা গড়তেও জানে, ইতিহাস গড়ে;
একহাতে চন্দ্র আর অন্য হাতে সূর্য এনে দিতে পারে
সিড়ি বেড়ে বেড়ে স্বপ্নরা আকাশো ছুঁতে পারে,
গ্রহ- নক্ষত্রের কক্ষ পথ/ ছায়াপথ ধরে ধরে স্বপ্নরা হাঁটে

স্বপ্নরা ভেঙে ও পড়ে-একেবারে চূর্ণ- বিচূর্ণ হয়ে;
আশার প্রদীপ নিভিয়ে।

স্বপ্নরা দেশান্তরিও হয়, উড়ে উড়ে,
সাত-সমুদ্র তের-নদী পাড়ি দিয়ে;
একেবারে দিগন্তের কাছে; যতক্ষণ না মুখোমুখি আসে

তারপর স্বপ্নরা একদিন ঘুমায়ে পড়ে,
একেবারে চুপিসারে।
কেউ জানবে না স্বপ্নরা অংকুরিত
হয়েছিল কোন এককালে/ অতীতে।

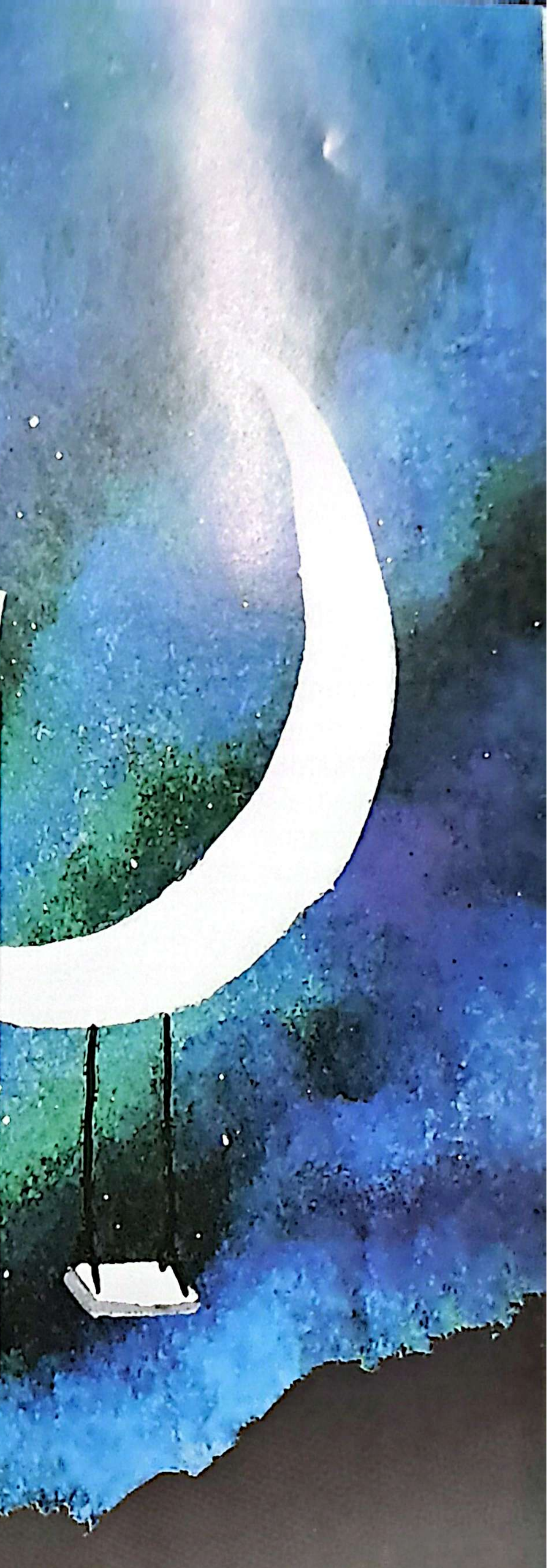

CamScanner

কিছু অভিলাষ

ডাঃ আবুল ফরাজ খান তুষার
এমডি, ফেইজ-বি রেসিডেন্ট
ইন্টারনাল মেডিসিন

অভিমান হয়ে নামে,
কিছু অভিযোগ
কখনো হয় না বলা,

করে শতবার
হৃদয়ে অভিযোজন,
অভিবাদনের
মাল্য পড়েছে গলা।

অভিযান করে
প্রেমে আর বিপ্লবে
এদিকে কখন
অভিসারী হল মন,

এক জীবনের
অভিজ্ঞতায় বুঝেছি
কিছু অভিনয়
খুব বেশি প্রয়োজন

"অভিধান"
যেখানে ক্লান্তি শেষে
থামে কোলাহল,
সেখানেই পথ খোঁজে
পথিকের দল।
দিন শেষে আঁধারের
গল্পের কাছে
ছায়া খোঁজে ছায়াহীন
মানবসকল।

দিন শেষে রাত্রির
নিরবতা ভেঙে
স্মৃতির বরফ কিছু
গলে যায় রোজ,
কিছু জল বয়ে চলে
অশ্রুর নামে
কিছু কথা থেকে যায়
তবুও নিখোঁজ।

তবু কিছু ছন্দের
মায়াজাল বুনে
অজস্র মুখোশের
আহাজারি শুনে,
কবিতার খাতা নিয়ে
চলেছে পথিক,
যে পথ হয়েছে লাল
হৃদয়ের খুনে।

যে পথে আবার কোন
মুসাফির থামে
আশ্রয় পেতে চায়
প্রেমে আর ঘামে,
সন্ধান করে যায়
অন্তবিহীন,
কেউ কি লিখলো চিঠি
আকাশের খামে।

CamScanner

তুমি

সুকান্ত দাশ
চমেক ৫৩
ফেজ বি রেসিডেন্ট, নেফ্রোলোজি

কোথায় যেন হারিয়ে গেছে স্মরণজিতের তালা
মনে পড়ে না ঘরে ফিরে না শ্রেয়সী ইন্দুবালা।
বয়েছিলে তুমি ফোরাত-দজলা ফ্রেটিস-টাইগ্রিসে
ডোডো পাখি তার খবর এনেছে জানলার কার্নিশে।

হেসেছিলে তুমি কলোসিয়ামে সভ্য করেছো গ্রিস
অ্যাজটেক তোমায় বরণ করেছে জানিয়ে কুর্নিশ।
চেঙ্গিস-মেরি, অশোক-বাথোরি ভুলে ছিল তোমাকে
মুনি-ঋষি যত প্রাচীন মনিষী লিখেছে স্তবক-শ্লোকে।

তুমি এনহেদুয়ানার প্রথম লিপি, গিলগামেশের প্রাণ
তুমি ইভের চোখের প্রথম কাজল নেফারতিতির ঘ্রাণ
একবার কেউ পেলে তোমাকে ভুলে যায় স্বাধীনতা
তুমি বরফ যুগের শেষ মানবীর হাসির সজীবতা।

মহাকাশ যেখানে সীমানা খুঁজে পায় গ্রহাণু কক্ষপথ
সেখানে তোমার দেখা পেয়েছিল সময়ের ইন্দ্ররথ।
সফোক্লিস, আর্কিমিডিস তোমাকে ভেবে আনমনা
তুমি কি অনু? পরমাণু অনু- না কি ঈশ্বর কণা?

পলি জমে বুকে নিবিড় সুখে লোকে শোক ভুলে যায়
তুমিই আবার জ্বলে পুড়ে ফুরাও নালন্দা-জান্দ্রিয়ায়।
তুমি যদি তাকাও হার মেনে নেয় সহস্র কৌরব
এই পৃথিবীর সব রমণীতে ফিরে তোমার অবয়ব।

অদৃশ্যময়তায় তুমি দেখা দাও আজও তুমি ঠিক তাই
তোমার ভেতরে তোমাকে খুঁজি তুমি আছ ঠিক কোথায়?

CamScanner

অনুতাপ

চৌধুরী মাহবুব সারোয়ার রাহী
৬৩তম প্রজন্ম

হঠাৎ বৃষ্টি নামল।
প্রথমে কয়েক ফোঁটা, তারপর দমকে আসা ঝুম।
আকাশ যেন ভেঙে পড়ল আমার উপর।
নিমিষেই জাদুর মতো থেমে গেল শহরের চঞ্চলতা।

হঠাৎ করে কমে গেল গাড়ির আনাগোনা,
দোকানিরা নামিয়ে দিল সাটার,
ভ্যানওয়ালারা পলিথিনে ঢেকে দিল তাদের জীবিকার বাহন।
যে যেখানে পেরেছে, নিয়েছে আশ্রয়।

কেউ ছাতার নিচে, কেউবা ঝাপ দেওয়া দোকানের ছাউনিতে
কারও চোখে ফিরতি পথের দুশ্চিন্তা,
কেউ আবার মেতে উঠেছে গল্পে।
কেউ বা বৃষ্টির টানে বাড়িয়ে দিয়েছে দু'হাত-
বলা চলে, অল্প পরিসরের এক বৃষ্টি বিলাস।

তবু বছরের প্রথম বৃষ্টি বলে কথা
জ্বরের ভয়ে কেউ কেউ ভিজতে সাহস করছে না,
তাদের মাঝে আমিও একজন।
এই রোবটিক ব্যস্ত জীবনে

আয়োজন করে বৃষ্টিতে ভেজার সুযোগ কোথায়!
তাই আজ নিয়ম ভেঙেই নামলাম রাস্তায়।
কাকভেজা হয়ে হেঁটে চলি ভিজে পথ ধরে,
ঠোঁটে ঠোঁটে ফিসফিস করি কিছু প্রিয় শব্দমালা।

শুনেছি, এমন সময় দোয়া কবুল হয়-
সেই বিশ্বাসে ছুঁয়ে দেখি
আকাশ থেকে ঝরে পড়া প্রতিটা বৃষ্টি ফোঁটা।

একদিন ঠিক বিকিয়ে দেব

মো: সাফাওয়াত হক ইমন
৩১তম বিডিএস
সেশন ২০১৯-২০২০

দিনগুলো বদলেছে খুব,
যেন সন্ধ্যার আকাশ -
একটুখানি রঙ, তারপর অচেনা ধোঁয়া।
মোবাইলের শব্দ বাজে,
কিন্তু তারও ভেতরে মায়া নেই -
সব কলই যেন শুধু দরকারি।

মনে পড়ে,
একসময় আড্ডার মাঝে উঠে আসত জান্নাতের গল্প,
আখিরাতের ভয়,
আর হৃদয়ে কাঁপন তুলত বিপ্লবের স্বপ্ন।
তখন মানুষ ছিল মানুষ,
নয়টা-পাঁচটার ক্যালেন্ডারে বন্দী নয়।

এখন আর কারো চোখে জান্নাত দেখি না,
কোনো মুহূর্ত পেরিয়ে গেলেও
মনে হয় না আমি বদলে গেলাম,
ভালো মানুষ হয়ে উঠলাম আরও একটু।
টাকা, স্ট্যাটাস, ভদ্রতার মুখোশ-
আমাদের ভিতরটা শুষে নিচ্ছে নীরবে।

আমার বড় ইচ্ছে হয়,
বৃষ্টির দিন সবাইকে নিয়ে মাঠে নামি,
ফুটবল খেলি ভেজা মাটিতে হেসে হেসে।
ব্যালকনির কোণে ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ,
আবার ফিরে আসুক গল্পের ছায়ায়।
আসরের পর মোড়ের টং দোকানে
ভেজা গেঞ্জিতে বসে থাকি - কিছু না ভেবেই।

আম্মা বলেন, "ঢাকায় কবে নিবি আমাকে?"
আমি হেসে বলি, "ওখানে তো মানুষ থাকে না মা!"
আমি তোকে নিয়ে যাব সবুজ ঘাসে,
যেখানে পাখিরা গান গায়
আর আকাশটা নীল হয় একদম সত্যির মতো।

একদিন আমি ঠিক দেখিয়ে দেব-
সফল হতে স্যুট-টাই লাগে না,
বেঁচে থাকা মানে বড় চাকরি নয়।
খেজুর, দুধ, আর ভোরের হিম বাতাসেই
আছে জীবনের আসল আরাম।

এই জীবন,
যে জীবন আমাদের নিষ্পাপতা কেড়ে নিয়েছে,
নিয়েছে হাসির প্রকৃত কারণ,
সেই জীবনটা আমি বিকিয়ে দেব -
এক কাপ চা, এক টুকরো আকাশ,
আর ভেজা পায়ের নির্ভার শান্তির কাছে।

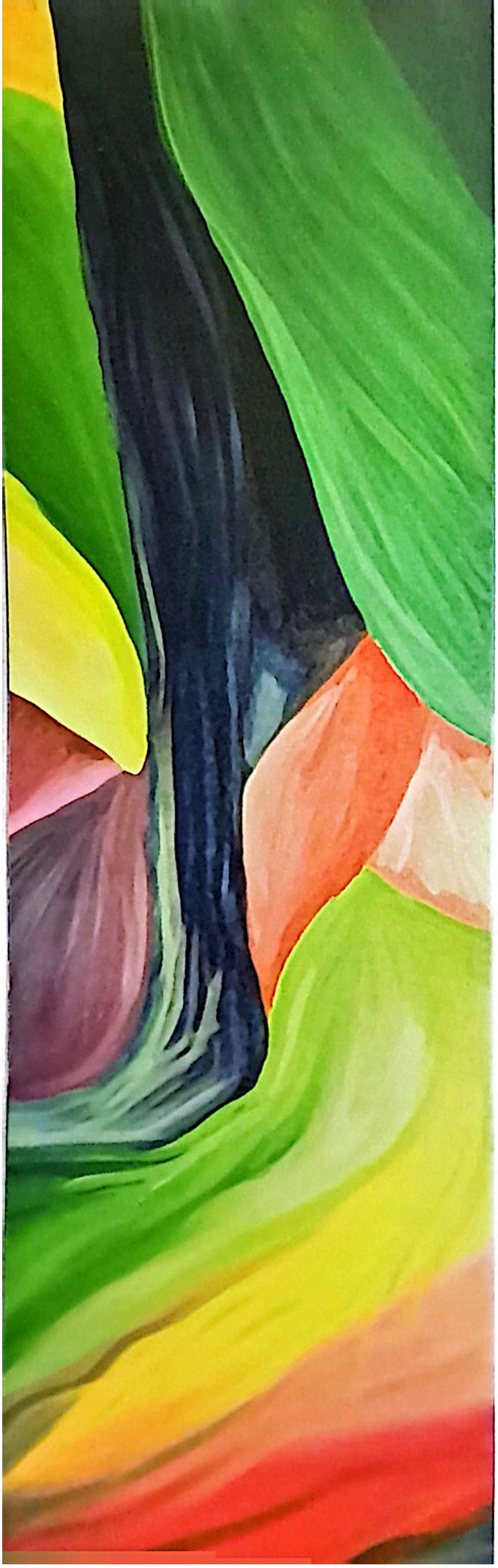

উড়ান

নাদিয়া সুলতানা
রোল: ৫২
৬৩তম এমবিবিএস

আমরণ সাতরে যাচ্ছি অদ্ভুত এই সাগরে
পা আটকে পড়ে পুরোনো সেই নোঙরে
ভেসে যাচ্ছি ভুল দিকে জীবিকার স্রোতে
ফেলা আসা সব স্মৃতি জীবনের মোড়ে
নতুন সহস্র শামুকের ভার জড়িয়ে শরীরে
ভেসে থাকার বৃথা চেষ্টায় আকুল পাথারে

মাঝে বুঝি ছিড়ে যাবো পঁচাশামুকের ধারে
দুদিকে দুই মহাকামী এ মারণ বানের টানে
অর্ধেক শরীর ভেসে যাবে, গড্ডালিকা স্রোতে
বাকিটা নাহয় তলিয়ে যাবে কষ্টে নিয়ে খাদে।
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে এ পরিত্যাক্ত দেহসত্ত্বাকে
মুক্তি দিয়ে পড়ে থাকা শান্তিকামী আত্মাকে

তবুও জানিনা কেন ইচ্ছে হয় অবিরাম
সব ফেলে আকাশের দিকে সেই উড়ান
দরকার শুধু উড্ডয়নী বাতাসের জোগান
প্রতিধ্বনিত চাই তোমার ভালোবাসি স্লোগান

বুকে ফুলে ওঠা তোমার
অফুরন্ত ভালোবাসার সাহসে
ভেজা ডানা ঝাপটে ছুটে যেতে চাই
ওই দূর নীল অনন্ত আকাশে

যেথায় থাকবেনা কোনো নির্দিষ্ট দিগন্ত
আকাশজোড়া বিচরণে থাকবে তোমার শান্ত অঙ্গ
যার আকুল আলিঙ্গন আমায় করবে ক্লান্ত
আর মনের ভালোবাসার আকুতিকে করবে শান্ত

কেও ডুবিয়ে দিলে হয়তো
ভাসার চেষ্টা আমি করতাম
কারণ সাতারনো আমি ভুলিনি
কিন্তু তুমি ছেড়ে দিলে

ওড়ার চেষ্টা কি করে করবো!!
তুমি ছাড়া যে উড়তে শিখিনি!

CamScanner

অস্তিত্বের আয়োজন

আনিকা আলবিন
রোল: ০৩
ব্যাচ: ৬৩তম এমবিবিএস

কৃষ্ণচূড়া তার লাল আভা জড়ানো মায়া নিয়ে
ক্লান্ত অপরাহ্নে রোদেপোড়া শহরের ক্ষণিক ছায়ায়
উষ্ণতার এক নব উন্মাদনা জাগানো অনুভবে
কোন এক শ্রাবণধারায় এক পৃথিবী দুঃখ সঙ্গী করে

ঝরে পড়ে অকালেই
ঠিক যেন কোন এক বিদ্রোহ মেনে নিয়েছে তার পরাজয়
যেন তার এই করুণ মৃত্যু উত্তম শত বেঁচে থাকার চেয়ে
যেন সে এসেছিলো, চলে যাওয়ার সমস্ত আয়োজন নিয়ে

যেন সে এসেছিলো ভালোবাসার রং চিনিয়ে দিয়ে
মানবের তরে একটু সুখ ছড়াতে।

অতঃপর...
তার প্রয়োজন ফুরোলো, সবুজের ভিড়ে সে নিশ্চিহ্ন হলো
পেয়ে হারানোর বেদনায় দেবদাস হলো কোন এক পথিক
জীবনের শেষ বিন্দু পর্যন্ত যে বিশ্বাস করতে চেয়েছিলো
কৃষ্ণচূড়ার রং মিথ্যে হয় না।

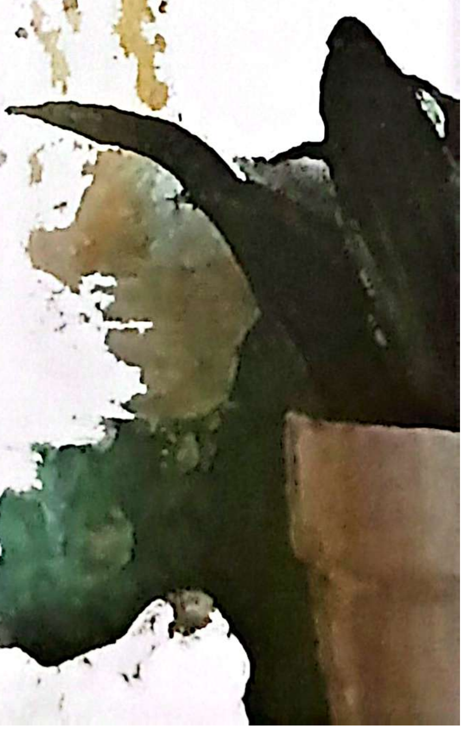

CamScanner

মেডিকেলের ছন্দ

শেখ আফরা আনান
রোল: ২৫, ৪র্থ বর্ষ
৩৩ বিডিএস

ভোর না ফুটতেই বাজে এলার্ম, চোখে ঘুমের ছাপ,
ক্লাসের আগে বই খুলে, হৃদয় পায় চাপ।
এনাটমি বলে-"হাড় গুনো, পেশী গুনো ভাই,"
ডেন্টাল এনাটমি বলে-"দাঁতের রুটে বাঁক পাবে তাই!"

ফিজিওলোজি শিখায় "হার্ট কেমন বাজে,"
ডেন্টাল ফিজিও বলে-"লালা কেন আসে?"
বায়োকেমিস্ট্রি বইয়ে দেখি-চক্রের চক্র খেলা,
ATP না পেলে জীবন যাবে ফেলা!

প্যাথোলজি স্লাইডে আসে রঙিন রঙের গান ওরাল
প্যাথোর ফিসফিস-"ক্যান্সারও আমার দান।"
ফার্মাকোলজি কষছে শপথ-"ড্রাগের নাম গুনে যাও,"
ডোজ ভুল হলে স্যার চেঁচাবে-"লাইসেন্সটা ফেলে
দাও!"

কমিউনিটি শেখায় জনস্বাস্থ্যের গান, ডেন্টাল পাবলিক
হেলথ বলে-"ওরাল হাইজিন-সুস্থতার প্রাণ।"
মেডিসিনে ডেভিডসন রাজা, হাজার রোগের তাল
কনসারভেটিভ বলে-"ফিলিং ছাড়া কেমন কাল!"

সার্জারির OT তে সেলাই শেখার দিন,
ওরাল সার্জারি হাসে-"দাঁত তুলব বিনা চিন!"
গাইনী বলে-"প্রসব করো সাবধানে,"
প্রোস্থোডন্টিকস হেসে-"ডেনচার লাগবে মানে।"

ENT-এ নাক-গলা খুঁটাই
Eye-তে চোখে টর্চ জ্বালাই
Psychiatry তে নিজেই প্রশ্ন করি,
"Sir, আমি পাগল নাকি শুধুই blurry?"

MBBS হোক বা BDS হোক,
রাত ৩টাই 'এর বই ঝোঁক!
যদি বলো কেমনে বাঁচিস?
ক্যাফে'র চা, আর ভাইভার হদিস।

দিনের শেষে ভাবি আমি- লাইফটা কি মজা?
কিন্তু পরীক্ষা এলে বুকের ভিতর বাজে বজ্ররাজা!

CamScanner

The Echo Beneath My Breath

Sumaiya Islam
5th year (63rd batch)
Roll-163

When a storm shakes me to the core,
You console me, whispering "Tawakkul"

When I feel lost in the stream,
You remind me our favourite -"Bear Gryll"

When everything feels contrary',
You turn hostility into amity.

Clouds surround me & I tremble,
But you vanish them like bubble.

High school,extra classes-I used to panic,
"I am ok calling you my 'class five classic' "

Though I travel for miles & miles,
Still yearn for your long drives.

You feared being late in exam hall
Look, Allah has handle it all,
Still, I wait for your call.

We don't talk like we did before,
Miss the Warmth I used to adore.

Baba, You are a gift from heaven,
Really a magician, who disappear my pain.

CamScanner

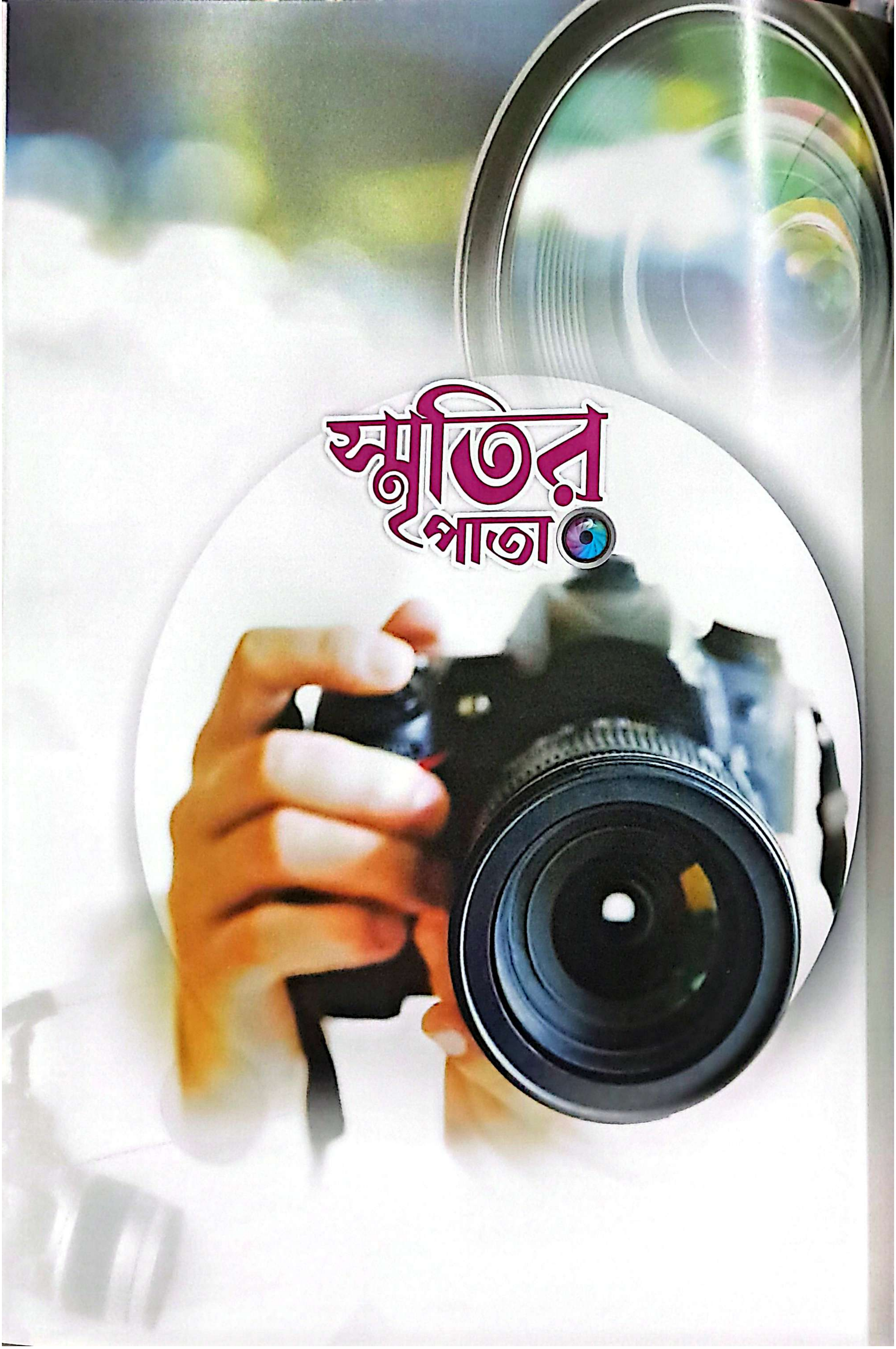

CamScanner

স্মৃতির পাতা

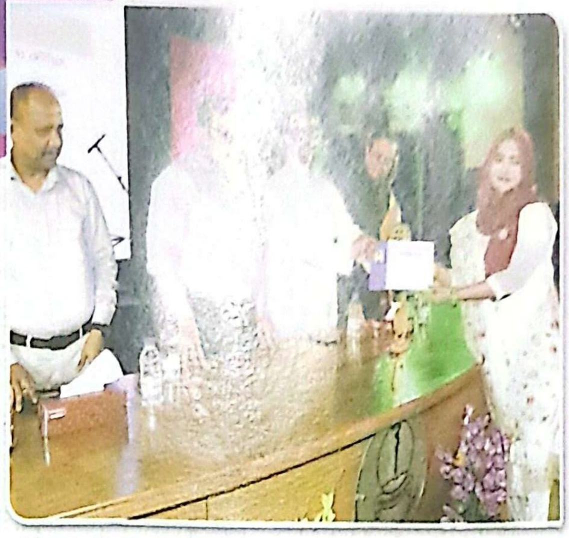

CamScanner

স্মৃতির পাতা

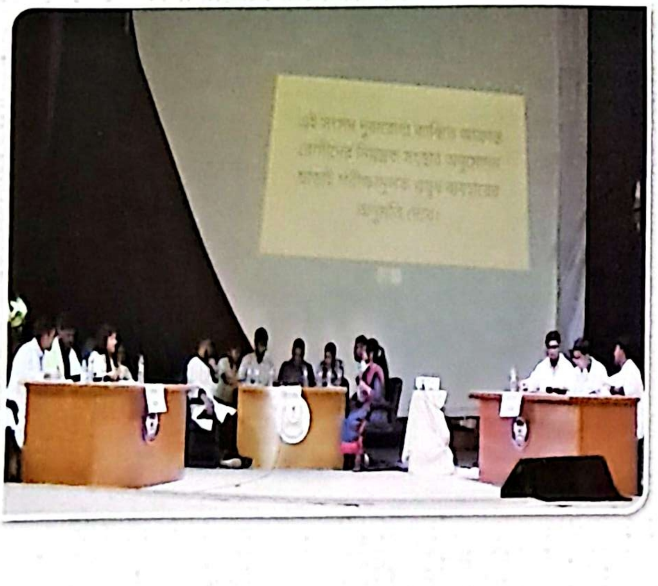

CamScanner

স্মৃতির পাতা

জুলাই বিপ্লব উদযাপন
স্থানঃ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

জুলাই পুনর্জাগরণ ২০২৫-এর
উদ্বোধন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

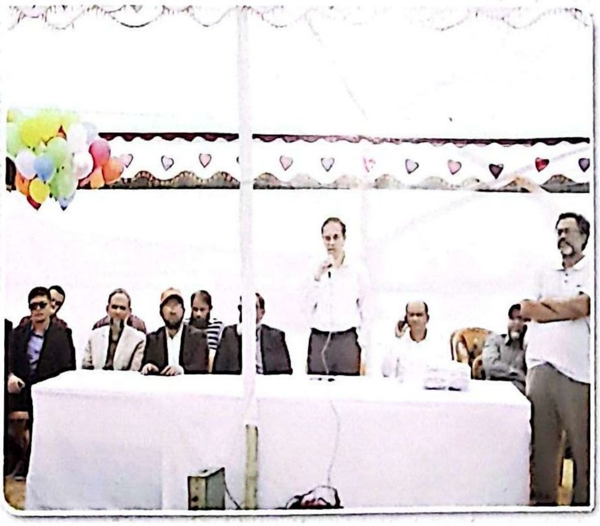

স্মৃতির পাতা

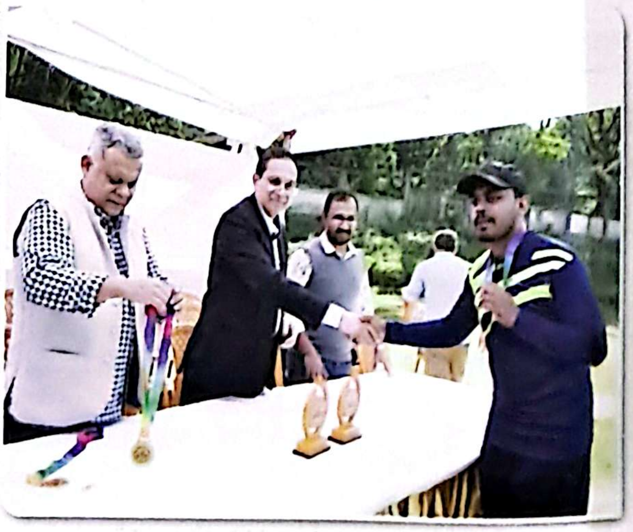

CS CamScanner

স্মৃতির পাতা

স্মৃতির পাতা

CamScanner

Print | SAVE TEXT
T. 02- 333357266, 01814-304958

CamScanner